বি য়া ফ্রা

সুরঞ্জন ভাদুড়ী

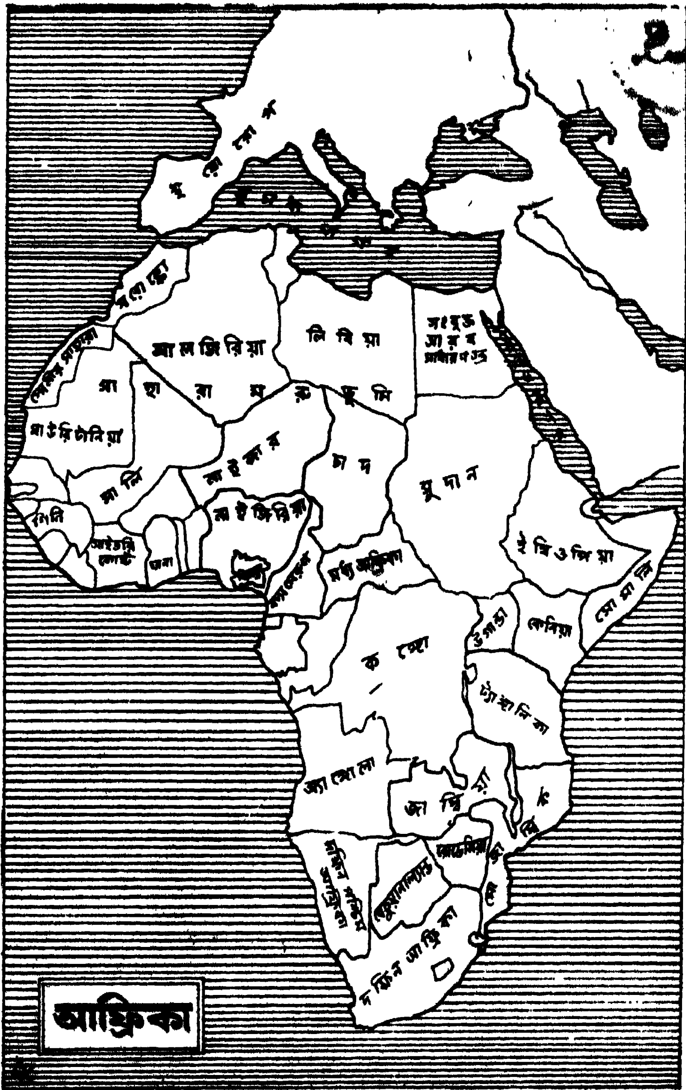
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক ॥ অজিতকুমার খান
কিশোর সাহিত্য সংঘ
৭৩, স্বামীজী সরণী । কলিকাতা ৪৮

মুদ্রাকর ॥ রামকৃষ্ণ পাল
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট । কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা । চারু খান



আফ্রিকা
মরক্কো
স্পেনিস সাহারা
আলজিরিয়া
লিবিয়া
সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র
সাহারা মরুভূমি
মৌরিটানিয়া
মালি
নাইজার
চাদ
সুদান
গিনি
আইভরি কোস্ট
ঘানা
নাইজিরিয়া
ক্যামেরুন
মধ্য আফ্রিকা
ইথিওপিয়া
সোমালি
কেনিয়া
উগান্ডা
কঙ্গো
ট্যাঙ্গানিকা
অ্যাঙ্গোলা
জাম্বিয়া
রোডেশিয়া
দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা
বেচুয়ানাল্যান্ড
দক্ষিণ আফ্রিকা

॥ এক ॥

সকাল বেলাতেই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল অশোক। সূর্যের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। মে মাস শেষ হতে আর একদিন বাকী। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। কিংসওয়েের মোড়ে এসে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে করতে একটু অবাক হয়ে গেল। পুলিশের তৎপরতা যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একটু বেশী। এদিক ওদিক চেয়ে একটাও ট্যাক্সি দেখতে না পেয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে বিস্মিত হয়ে গেল সামনের দিকে চেয়ে। একটা ট্রাক এসে থামল তার সামনে। মিলিটারী ট্রাক। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পাঁচ ছয়জন সৈন্য লাফিয়ে নেমে পড়ল। আর তাদের কমাণ্ডার মুহূর্তের মধ্যে নির্দেশ দিয়েই ট্রাক নিয়ে সামনের দিকে ছুটে চলে গেল।

সব দোকানপাট খোলা। রাস্তা দিয়েও বেশ লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে। একটু নজর করলেই বেশ বোঝা যায়, সকলেই কেমন গম্ভীর, চাপা উত্তেজনার ভাব সবার মুখে। বিশেষ করে আজ দিন চারেক ধরে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। হাতঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে ওঠে অশোক। অবিলম্বে একটা ট্যাক্সির প্রয়োজন, নইলে হয়তো প্রেস কন্‌ফারেন্সে সময় মত উপস্থিত হতে পারবে না। কিন্তু এই সকাল বেলায় কর্ণেল ওজুকয়ু প্রেস কন্‌ফারেন্স ডাকলেন কেন? আজ কি কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন যার জন্য সাত সকালে প্রেসকে ডেকেছেন। বিশেষ করে গত চারদিনে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে আজকের গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট।

একদল আফ্রিকান ছেলে হল্লা করতে করতে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই অশোক বুঝতে পারে যে এরা সবাই ইবো। আর তারা নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড তর্ক করছে। ছেলেগুলো অশোকের সামনে এসে থেমে যায়।

—আপনি ইণ্ডিয়ান? কী করেন?

—সাংবাদিকতা।

—আপনাকেই আমাদের দরকার। লাগোসের কোন খবর জানেন?

—কাদুনায় নাকি আবার দাঙ্গা লেগেছে?

—বেনোন সিটিতে নাকি একজনও ইবো নেই?

—কেন্দ্রীয় সরকার নাকি চাকরি থেকে সব ইবোদের বরখাস্ত করেছে?

একসঙ্গে তিনচার জন অশোককে ঘিরে প্রশ্ন করতে থাকে। এতজনের প্রশ্নের জবাব একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, অদ্ভুত এই সব প্রশ্নের কীই বা জবাব হ'তে পারে।

তাকে নীরব থাকতে দেখে একটা লম্বা মত ছেলে বলে—আশাকরি একজন সৎ সাংবাদিকের সঙ্গে আমরা কথা বলছি।

—এ আশা আপনারা সব সময়েই করতে পারেন।

—তবে আমাদের কথার উত্তর দিন।

—দেখুন, শহরে অনেক গুজব ছড়িয়েছে। তার সব কিছু সত্যি নয়।

—আপনি নিশ্চয়ই চেপে যাচ্ছেন। একটু উত্তেজিত হয়ে আর একজন বলে।

—কিছু মনে করবেন না। এই মুহূর্তে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবার মত মানসিক স্থিরতা আমার নেই। কর্ণেল ওজুকয়ু প্রেস কন্‌ফারেন্স ডেকেছেন সেখানে যাবার জন্য আমি ব্যস্ত।

মুহূর্তের মধ্যে তাদের ভাবান্তর দেখা যায়। এই মুহূর্তে একটা বিরাট কিছু করার জন্য যেন তারা প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

—কেন প্রেসকে ডেকেছেন, জানেন কিছু ?

—না।

—অনুমান ?

—কিছু বলতে পারছি না। হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবেন।

—আমাদের জানাতে হবে সে খবর।

—কাগজেই দেখতে পাবেন। হেসে জবাব দেয় অশোক।

—অনেক খবর আপনারা চেপে যান।

দু'চারজন করে বেশ ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে। একদল আফ্রিকান্ একজন ভারতীয়কে ঘিরে ধরে নানারকম প্রশ্ন করছে। ব্যাপারটা কারো কাছে বিশেষ বোধগম্য না হলেও, সকলেই উৎসুক হয়ে অশোকের দিকে চেয়ে রয়েছে। দু'চারজন নানারকম মন্তব্য শুরু করে দিয়েছে। লম্বা মত ছেলেটি হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে

—কর্ণেল ওজুকয়ু জিন্দাবাদ

সমস্বরে আওয়াজ ওঠে। তারপরেই তারা সমানে স্লোগান দিতে থাকে।

—গওন সরকার

—ধ্বংস হোক।

মোড় থেকে পুলিশ অফিসার ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী এসে ঘিরে ফেলে। লোকজন সন্ত্রস্ত হয়ে একে একে চলে যাবার চেষ্টা করতে থাকে। আশে পাশের দোকান ঝটপট করে বন্ধ হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে একটা থমথমে ভাব নেমে আসে। একজন অফিসার এগিয়ে এসে গম্ভীর স্বরে ফেটে পড়েন—হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার ? তারপরেই অশোকের দিকে নজর পড়তেই জিজ্ঞেস করেন—ফরেনার ?

—ইয়েস, প্রেস।

—এখানে ভিড় করছেন কেন ?

—ভিড় নয়, এরা আমার পরিচিত, আজকের খবর জানতে চাইছে।

—না, আপনারা স্লোগান দিয়েছেন, আপনি উত্তেজনার সৃষ্টি করছেন—আই শ্যাল এ্যারেষ্ট ইউ।

অশোক তার প্রেস আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখায়। আজকের প্রেস কনফারেন্সের কথা বলে। মনে হয় অফিসারটি এবার একটু নরম হয়েছে। মুখে কোন রকম ভাব প্রকাশ না করে বলেন—এক মিনিটের মধ্যে যদি আপনারা এখান থেকে না চলে যান আই শ্যাল এ্যারেষ্ট অল অফ ইউ।

তার কথা মুখ থেকে বের হতে না হতেই ভিড় কমতে শুরু হয়। ছেলেগুলো তার দিকে একবার চেয়ে আবার এগিয়ে যায়।

ঘড়ির দিকে চেয়ে অশোক রীতিমত অস্থির হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময় একটা ট্যাক্সি তার সামনে এসে থেমে যায়। দরজাটা খুলে ভেতর থেকে আহ্বান আসে—মিঃ রয় কাম ইন।

ট্যাক্সির ভেতর ঢুকে অশোক বলে—থ্যাঙ্কয়ু মিঃ আকুয়া। একটু আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলাম।

—কী ব্যাপার ?

আগাগোড়া ঘটনার বর্ণনা করে অশোক।

—ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি সর্বত্র একটা কেমন থমথমে ভাব। আপনি কি সেদিনের মিটিংয়ের ডিটেলস্ জানেন না ?

—কাগজে দেখেছি।

—খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সভা।

—কিন্তু এ ধরণের ঠাণ্ডা লড়াই কতদিন চলবে।

—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় সে দিনের মিটিংয়ের পর কর্ণেল একটা সাংঘাতিক কোন সিদ্ধান্ত নেবেন।

গত ২৬ তারিখে মিলিটারী গভর্ণরের পরামর্শদাতা সমিতির সভা প্রচণ্ড উত্তেজনা আর হট্টগোলের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। ৩৩৫ জনের

সভা যখন বসে তখন অনেকের মুখেই শোনা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি? পূর্ব নাইজিরিয়া বারবার উত্তরের হাতে মার খাচ্ছে, এর কি কোন সমাধান নেই? যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমান ব্যবহার করছেন না। সুতরাং পূর্ব নাইজিরিয়াকে বাঁচতে হলে ··

বাঁচতে হলে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

সভার মধ্যে যেন বোমা ফেটে পড়ল। অনেকেই আঁচ করেছিল হয়তো, এ ধরণের একটা প্রস্তাব আসতে পারে। তবুও কর্ণেল ওজুকয়ু ধীর ভাবে সব কিছু ভেবে দেখবার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু সভার বেশ একটা বড় অংশ অত্যন্ত গোঁয়ারের মত বিচ্ছিন্নতার দাবি তুলে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় হৈ চৈ হট্টগোল। সকলেই চায় না যে এই মুহূর্তে পূর্ব নাইজিরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র দেশ হয়ে উঠুক। কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই সভা ভেঙে গেল।

পরদিন ফলাও করে কাগজে এ সংবাদ পরিবেশন করার পর থেকেই কেমন একটা থমথমে ভাব। মনের মধ্যে যে-সাম্প্রদায়িক মনোভাব সুপ্ত হয়েছিল, সংবাদপত্রগুলো তাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলল। কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠতে থাকে।

পরদিন কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী অবস্থার ঘোষণা করে সমগ্র দেশকে বারটি অঙ্গরাজ্যে ভাগ করার প্রস্তাব দেন। ফলে পূর্ব নাইজিরিয়া রাজ্য তিনটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবে।

ট্যাক্সিটা হঠাৎ থেমে গেল। ট্রাফিক জাম। ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

—বড্ড দেরী হয়ে গেল।

—না, ঠিক সময়েই পৌছুবো। আচ্ছা মিঃ রয়, আপনার কী মনে হয়।

—ঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক দিন দিন অবনতির পথে চলেছে।

—আমার মনে হয় একটা কিছু চরম পরিণতি শিগগীর হবে। তিন চারটে মিলিটারী ট্রাক পাশ দিয়ে চলে গেল। ট্যাক্সি আবার ছুটে চলেছে। রাস্তায় পুলিশ ছাড়াও মিলিটারী টহল দিয়ে ফিরছে।

—মিঃ আকুয়া, লক্ষ্য করেছেন কী রকম মিলিটারী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পর থেকেই মিলিটারীর টহল বেড়ে গেছে।

—তবে কি রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ যথারীতি পালন করছে।

—সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ওজুকয়ু এখনো গওনকে মানেন না। কেন্দ্র থেকে গওন সরে গেলে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠবে?

—না।

—তবে?

—দেখা যাক আজকের কনফারেন্স।

স্টেট হাউসের বেশ কিছুটা দূরে ট্যাক্সি থেমে গেল। আর সম্মুখে এগোনোর উপায় নেই। পরপর প্রাইভেট গাড়ি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁরা দুজনে ট্যাক্সি থেকে নেমে হাঁটতে সুরু করে। অশোকের সঙ্গে আকুয়ার বেশ সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে। জন আকুয়া। ইবিবিবো উপজাতি। পেশায় সাংবাদিক। এই দীর্ঘদেহী আফ্রিকান যুবকের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করেছে অশোক। আর তার কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেছে নাইজিরিয়ার ইতিহাস।

গেটের কাছে আসতেই তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল দুজন সামরিক বাহিনীর লোক। পাশেই একটা টেবিল নিয়ে একজন অফিসার বসে রয়েছে। তার কাছে আইডেনটিটি কার্ড দেখাতেই

তাদের ভেতরে যাবার অনুমতি দিল। অত্যন্ত সতর্কের সঙ্গে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বত্রই সামরিক বাহিনী টহল দিয়ে ফিরছে। যে কোন রকম অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য তারা প্রস্তুত।

ভেতরে প্রবেশ করে বোঝা গেল প্রেসের লোক ছাড়া আরো অনেককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিরাট হল ঘরের মধ্যে এক অংশ প্রেসের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ঠিক মাঝখানে শহরের বেসামরিক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য বসার জায়গা। আর এক ধারে বিদেশী হোমড়া চোমড়া এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের স্থান করা হয়েছে। অপর দিকে মিলিটারী গভর্ণর তার সরকারের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে বসবেন। কর্ণেল ওজুকয়ু তখনো আসেন নি। অশোক চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে দেখছে। দরজার মুখে দুজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। হলঘরের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে সামরিক বাহিনীর অফিসাররা যাতায়াত করছেন। তারা সবাই খুব ব্যস্ত এবং সন্ত্রস্ত। মুখে চোখে একটা কঠোরতার ভাব, তাদের ওপর যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে সে সম্বন্ধে তারা যথেষ্ট সচেতন।

কিছুক্ষণ বাদেই কর্ণেল ওজুকয়ু প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মেজর জেনারেল এফিয়ং, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, চিফ সেক্রেটারী মিঃ আকপান, ডাঃ কুকে, মিঃ কোগবারা এবং আরো অনেকে। তাঁরা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, অধীর আগ্রহে সবাই উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। কর্ণেল ওজুকয়ু বলিষ্ঠ চেহারা, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব নিয়ে সবার সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

বছর ছত্রিশ সাঁইত্রিশের কর্ণেল আজ নাইজিরিয়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার মূলেও তিনি। কিন্তু কিছুদিন আগেও তিনি কর্ণেল ছিলেন না এমন কি সামরিক বাহিনীতেও ছিলেন না। বেসামরিক ব্যক্তি, সরকারের বড় চাকুরে।

কৃষ্ণকায় কোটিপতি স্যর লুই ওডুমেগুয়ু ওজুকয়ুর দ্বিতীয় পুত্র চুকওয়েমেকা ওডুমেগুয়ু ওজুকয়ু। ধনপতির আদুরে সন্তান ক্যাথলিক মিশন গ্রামার স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য সেখান থেকে তাকে পাঠান হল পাবলিক স্কুলে। তের বছর বয়সে তাকে ইংল্যাণ্ডে পাঠান হল। তারপর অক্সফোর্ডে। ওজুকয়ুর পিতা চেয়েছিলেন ছেলে আইন পড়ে বড় উকিল হবেন, কিন্তু ছেলের সঙ্গে পিতার বিরোধ বাধল। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ছেলে ইতিহাস নিয়ে পড়া শুরু করল। তিন বছর অক্সফোর্ডে থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এল নাইজিরিয়ায়। কিন্তু পিতার সঙ্গে আবার সংঘাত শুরু হল। বাবা চাইলেন ছেলে ব্যবসা দেখুক, কিন্তু সর্বত্রই বাবার অদৃশ্য হস্ত দেখে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সরকারী চাকরি নিয়ে সুদূর উত্তরে চলে যাবার চেষ্টা করল। তার ধারণা, সেখানে হয়তো বাপের প্রতিপত্তি তার উপর বর্তাবে না। কিন্তু তাকে পাঠান হলো পূর্ব নাইজিরিয়ায়। তাঁর ইচ্ছে ছিল বাপের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু চাকরি করতে গিয়ে দেখল সর্বত্রই স্যর লুইয়ের প্রভাব। এমন কি তাঁর অফিসার সব সময়ে তাঁকে সমীহ করে চলেন। দু বছর চাকরি করতে না করতেই তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। অবশ্য এই দু বছরে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশেছেন। দুবছর বাদে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবেন বলে স্থির করেন। এটন হলে অফিসার ট্রেনিং নিয়ে সেকেণ্ড লেফট্যানাণ্ট হন। তারপর থেকে ধাপে ধাপে তিনি একটার পর একটা প্রমোশন পেয়ে চললেন। এরপর তাকে ঘানায় পাঠানো হয় মিলিটারী কলেজের অধ্যাপক করে। কিছুদিন পরে তিনি রাষ্ট্রসংঘের সামরিক বাহিনীর হয়ে কঙ্গোয় যান। সেখান থেকে ট্রেনিংয়ের জন্য আবার ব্রিটেনে এবং সেখান থেকে দেশে ফিরে তিনি লেফট্যানাণ্ট কর্ণেল হন। তারপর ১৯৬৬ সালে পূর্ব নাইজিরিয়ার মিলিটারী গভর্ণর।

কর্ণেল উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ্য করে বলতে শুরু করেন—হে স্বদেশ বাসী, হে পূর্ব নাইজিরিয়ার অধিবাসী, আপনারা জানেন যে দীর্ঘকাল ধরে আমাদের ওপর নানা রকম অবিচার চলছে। আমার বিশ্বাস, পূর্ব নাইজিরিয়ার বাইরে এমন কোন সরকার নেই যে আপনাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। আপনারা মুক্ত স্বাধীন মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনাদের নিজস্ব কতগুলো অধিকার রয়েছে, কিন্তু আজ আপনারা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সুতরাং আপনাদের কারুর সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন লাভ নেই। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বর্তমান পূর্ব নাইজিরিয়ার সামরিক শাসন ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করা উচিত হবে না। এই কারণেই আমরা নাইজিরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করতে চাই। দীর্ঘকাল ধরে আমাকে সুযোগ দিয়েছেন আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করে সেবা করার। আমার উপর আপনাদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আপনাদের তরফ থেকে ঘোষণা করছি যে পূর্ব নাইজিরিয়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

Now therefore I, lieutenant colonel Chukwuemaka Odumegwu Ojukwu, Military Governor of Eastern Nigeria by virtue of the authority, and pursuant to the principles recited above, do hereby solemnly proclaim that the territory and region known as and called Eastern Nigeria, together with her continental shelf and territotial waters shall henceforth be an independent sovereign state of the name and title of 'The Republic of Biafra'.

নিস্তব্ধ হলঘরের মধ্যে বোমা বিস্ফরণ হলেও বোধহয় তত বিস্মিত কেউ হত না। কর্ণেলের ঘোষণায় সবাই হতচকিত বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল। কারুর মুখে কোন কথা নেই। ব্রিটিশ হাইকমিশনারের প্রতিনিধির দিকে চেয়ে দেখল অশোক। তার মুখ আরো লাল

হয়ে উঠেছে। অন্যান্য বিদেশীরা নিশ্চুপ হয়ে মাথা নীচু করে রয়েছেন। আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটরা উদাসভাবে সকলের দিকে চেয়ে রয়েছেন। নিস্তব্ধতার হাড়কাঁপানো শিরশিরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে যেন! হঠাৎ চকিত হয়ে সবাই শুনলেন একজন সাংবাদিকের প্রশ্ন—এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে গ্রহণ করবেন বলে আপনার মনে হয়।

—কোনও কেন্দ্রীয় সরকার মানি না, বিয়াফ্রা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

—পূর্ব নাইজিরিয়ার জনসাধারণ যদি আপনার সঙ্গে একমত না হয়?

—তাদের অনুমতি নিয়েই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

—আপনার সিদ্ধান্ত অবৈধ।

—নিজের সীমা সম্বন্ধে সচেতন হোন। সাংবাদিকের কর্তব্য ভুলে যাবেন না।

—কেন্দ্রীয় সরকার কি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন?

—জানি না। কোনও সরকার মেনে নিল কি না, সে বিষয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই।

—আপনি কি মনে করেন কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না?

—জানিনা। আমাদের দেশের ওপর অন্য সরকারের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

—কেন্দ্রীয় সরকার যদি আপনার সিদ্ধান্ত না মেনে পূর্ব নাইজিরিয়ায় হস্তক্ষেপ করে, তখন কী করবেন?

—পূর্ব নাইজিরিয়া বলে আর কিছু নেই, স্বাধীন বিয়াফ্রার উপর যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে তা প্রতিরোধ করা হবে।

—প্রতিরোধ বলতে আপনি কী বুঝাতে চাইছেন?

—হস্তক্ষেপের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

—যদি সামরিক হস্তক্ষেপ হয়?

—সামরিক প্রতিরোধ হবে। বিয়াফ্রার জনসাধারণ মাতৃভূমি রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন দেবে। নাইজিরিয়া সরকারের অধিকার নেই অন্য রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ করার।

—পূর্ব নাইজিরিয়া সরকার কী এতদিন ধরে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করছেন না।

মুহূর্তের জন্য কর্ণেল থেমে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—আমি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছি বলেই আমার ধারণা—কোন রাজনীতিকের সঙ্গে নয়।

—গওনের বদলে যদি আপনি কেন্দ্রীয় সরকার দখল করতেন তবে কি বিয়াফ্রার সৃষ্টি হত?

আবার থমকে গেলেন কর্ণেল। এ প্রশ্নে তিনি রীতিমত রুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু কোন রকম ক্রোধ প্রকাশ না করে স্মিত হেসে বললেন—কনফারেন্স আজকের মত শেষ।

প্রেস কনফারেন্স শেষ হয়ে গেল। অশোক, মিঃ আকুয়ার সঙ্গে বের হয়ে এলো। সকলের মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন। স্টেট হাউস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে ট্যাক্সির খোঁজে এদিক ওদিক চাইতে থাকে দু'জনেই। দ্রুত সংবাদ ডেসপ্যাচ করতে হবে।

সামনে একটা ট্যাক্সি পেয়েই ছুটে গেল তারা।

পৃথিবীময় টেলিপ্রিণ্টারে একটার পর একটা শব্দ ছাপা হয়ে যেতে লাগল।

নাইজিরিয়া দ্বিখণ্ডিত······বিয়াফ্রা—একটি নূতন রাষ্ট্র······বিয়াফ্রা নাইজিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন।

পৃথিবীর বুকে আর একটা রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল। ছিন্ন ভিন্ন আফ্রিকার বুকে আর একটি দুষ্ট ব্রণ জন্ম নিল সর্বদেহকে বিষাক্ত করার জন্য। বছর কয়েক আগে এমনি করেই কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট শোম্বে কাতাঙ্গা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে ছিলেন। সেদিন রক্তাক্ত কঙ্গোকে অনেক মূল্য

দিতে হয়েছিল। নাইজিরিয়াকে ভবিষ্যতে কী মূল্য দিতে হবে কে জানে।

সন্ধ্যের আলো জ্বলে উঠেছে। ঝলমলে নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপনে পথ আলোকিত। একটা নিরালা কোন দেখে অশোক নির্জন একটা টেবিলে এসে বসল। সামনে মৃদু সুরে অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে। এখানে ওখানে গোল হয়ে আফ্রিকান ছেলেরা উত্তেজিত ভাবে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। তাদের কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না। শুধু মাঝে মাঝে বিয়াফ্রা শব্দটি শুনে অনুমান করে নিতে হয়। যারা তর্ক করছে তারা সবাই ইবো উপজাতীয়। অন্যান্য যারা রয়েছে তাদের চোখে মুখে শঙ্কা স্পষ্ট। ইতিমধ্যে রেডিও থেকে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে নাইজিরিয়া থেকে বিয়াফ্রার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংবাদ। কর্ণেল ওজুকয়ুর এ বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে।

—হ্যালো মিঃ রয়, আপনি।

—মিস্ মেহতা আপনি এখানে?

—আমিও তো সেই কথা জিজ্ঞেস করছি?

—আমরা সাংবাদিক সর্বত্র ঘুরে বেড়াই।

—রিয়েলি আপনারা খুব মজার লোক। হেসে ওঠে মিস্ মেহতা। সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে। বসবার সময় কাঁধ থেকে নাইলনের আঁচলটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল, আবার তুলে নিয়ে সযত্নে কাঁধের ওপর রেখে দেয়।

—আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল মিঃ রয়।

—বলুন। যদিও আমার এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি, তবু হয়তো আপনার কথা শোনার মত সময় হবে।

বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই অশোক দু'কাপ কফির অর্ডার দেয়।

—সেকি আর কিছু বলবেন না।

—না।

—তবে আমি বলি।

—না, এখন থাক।

বেয়ারা পেন্সিল দিয়ে অর্ডার লিখে নিয়ে চলে গেল।

—আগামী রোববার আমাদের ইণ্ডিয়া লীগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, আপনি আসছেন তো।

—রোববার অনেক দেরি, এখন যা অবস্থা কিছুই আগে থেকে বলা যায় না।

—আপনাদের সব সময় একটা ব্যস্ততার ভাব। কী এমন হয়েছে।

—কেন, আপনি জানেন না বিয়াফ্রা নাইজিরিয়া থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

—রেডিওতে শুনেছি বটে।

তার কথায় অবাক হয়ে যায় অশোক। এতবড় একটা খবরের কোন গুরুত্বই নেই তার কাছে। আর পাঁচটা সাধারণ খবরের মত এও যেন। বেয়ারা এসে হু'কাপ কফি দিয়ে গেল। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মিস মেহতা ধীরে ধীরে বলে—বলতে গেলে আমরা বিদেশী; রাজনীতির আলোচনা আমাদের না করাই ভালো।

—তবে থাক, সুলোচনা বৌদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

—অনেক দিন হয়নি। কেন বলুন তো? মিস্ মেহতার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

—না এমনি।

—ওঃ। আবার চুপ করে কফির কাপে চুমুক দেয়। অনেকক্ষণ ধরেই এদিক ওদিক চাইছে। বোধহয় কাউকে খোঁজ করছে সে। বেশ ভিড় হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকটি টেবিলই ভর্তি। টেবিলের উপরে ঝুঁকে নীচগলায় বলে—অশোক, আমার একটা উপকার করতে হবে।

তার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতায় অশোক সোজা তার দিকে চায়। চোখে মুখে একটা অসহায়তার ভাব ফুটে উঠেছে। অস্থিরচিত্ত নিয়ে সে এখানে এসেছে দেখলেই বোঝা যায়। মাথার চুল উড়ে এসে কপালে পড়ছে, আঁচলটা আবার অনেকটা নেমে গেছে। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে।

—নিরুপায় হয়ে আপনার সাহায্য চাইছি মিঃ রয়। করুণ চোখে মিস মেহতা বলে।

—বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।

—এখানে নয়, কাল আপনাকে ফোন করব। শুধু একটা অনুরোধ সুলোচনা বৌদির কানে যেন না ওঠে। উনি একটি আস্ত গেজেট। আচ্ছা আজ চলি।

মিস মেহতা বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবার পর অশোকের মনে হল, কোণের টেবিলে যে আফ্রিকান ছেলেটি বসেছিল সেও বোধহয় ওর বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল। ছেলেটি বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠ। হয়তো তার বন্ধু হবে।

মীরা মেহতাকে এখানে অনেকেই চেনে। তার বাবা দয়ালভাই মণিলাল মেহতা দেশ থেকে কপর্দকহীন হয়ে এদেশে এসেছিলেন, তারপর অনেক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কোটিপতি না হলেও অন্তত লাখপতি হয়েছেন আজ। তার দু'ছেলে এখনো লণ্ডনে রয়েছে। মীরাও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। এখানে এসেও ইংরেজ সমাজের সঙ্গে তার পরিচিতি কিছুমাত্র কমেনি, আবার আফ্রিকান ছেলেরাও তাকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখে। ইদানীং তাকে একজন আফ্রিকান ছেলের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যায়। এসব অবশ্যই অশোকের শোনা কথা, নিজে কিছুই দেখেনি। সবই সুলোচনা বৌদির কাছে শোনা। সুলোচনা বৌদি বেশ খবর রাখেন।

—হ্যালো, কতক্ষণ এসেছেন?

অশোক পেছন ফিরে চেয়ে দেখে—মিঃ জন আকুয়া।

—অনেকক্ষণ এসেছি, এত দেরি হল যে।

—বলছি, আগে পানীয়ের ব্যবস্থা করি।

বেয়ারা আসতেই ছ'বোতল বিয়ারের অর্ডার দেয় মিঃ আকুয়া। বিয়ার দিয়ে যেতেই কিছুটা পান করে নিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে। চেয়ারে হেলান দিয়ে অলস ভাবে বসে আরাম উপভোগ করতে থাকে।

—কি ব্যাপার, আরামে একেবারে চোখ বুজে আসছে যে। ঠাট্টা করে অশোক বলে।

চেয়ার, থেকে গা না তুলে আকুয়া জবাব দেয়—বা রে, আরাম হবে না, আজ উৎসবের দিন।

—উৎসব ? কিসের উৎসব।

—স্বাধীনতার। বাইরে বেরিয়ে দেখুন, সারা সহর উৎসবের সাজে নেচে উঠেছে, ইবো ছেলে মেয়েদের হৈ হল্লায় রাস্তা চলা দায়।

—সে কি !

—হ্যাঁ তাই। গম্ভীর হয়ে আকুয়া বলে। চোখে মুখে চিন্তার ছাপ, শরীরে কেমন একটা ক্লান্তির প্রলেপ।

—আপনি কি খুশি হননি মিঃ আকুয়া ?

—তা হয়েছি বটে। আ-শৈশব যে দেশকে মাতৃভূমি বলে জেনে এসেছি, একজন মানুষের কথায় সেটা বিদেশ হয়ে গেল। নিজের ভাই বোন হয়ে গেল বিদেশী। আপনজন হয়ে গেল শত্রু, এর পরেও কি খুশি না হয়ে পারি মিঃ রয়। আকুয়ার গলা ধরে এসেছে। মনের কোন এক গহীন অতল থেকে বেদনা ঝরে ঝরে পড়ে।

অশোকের মনে পড়ে ঠিক কুড়ি বছর আগে এমনি এক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, এশিয়ার এক কোণে লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জলে। কলমের এক খোঁচায় দেশ হয়ে গিয়েছিল বিদেশ, আবাল্য খেলার সঙ্গী হয়ে গেল শত্রু। এখনো আবছা মনে পড়ে বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পদ্মা, বুকে পাল তোলা নৌকো নিয়ে। পদ্মাপারের

প্রাণ মাতানো হাওয়া, আজ আর সহজলভ্য নয়। নিজের মন দিয়ে সে বুঝতে পারে আকুয়ার মন কী এক অসাধারণ বেদনায় অধীর হয়ে উঠেছে।

—মন খারাপ করে কোন লাভ নেই মিঃ আকুয়া।

—না, না, দেখুন না কী সুন্দর সাজিয়েছে, আসুন উপভোগ করি।

সত্যি রেঁস্তরাটা খুব সাজিয়েছে। এতক্ষণ অশোক ভাল করে লক্ষ্য করেনি। কাগজের বড় বড় ফুল ছাদ থেকে ঝুলছে। রঙিন কাগজের লম্বা লম্বা ফালি পাকিয়ে পাকিয়ে একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত টাঙানো হয়েছে। ছোট ছোট রঙিন আলোর মালা দেওয়ালের চতুর্দিক থেকে ঝুলছে। হঠাৎ মাইকে কি একটা ঘোষণা হল। প্রথমে ঠিক খেয়াল না করলেও পরে বোঝা গেল, মিস্ সুসেনের নাচ ও গান আজ রাতে পৃষ্ঠপোষকদের অভ্যর্থনা করবে।

হৈ হৈ করতে করতে চারজন আফ্রিকান ছেলে মেয়ে প্রবেশ করল। পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে তাদের বয়স। ইবো উপজাতি। এসেই এমন হৈ হৈ শুরু করে দিল যে বেয়ারা সব সময় তটস্থ হয়ে রইলো। দু'এক পেগ পেটে পড়তেই একেবারে বেসামাল অবস্থা। তারা পরস্পর যেভাবে ধরাধরি করে চলবার চেষ্টা করল তা দেখে অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। আনন্দের আতিশয্যে স্থান কাল ভুলে গিয়েছে। ডানদিকের ছেলেটি পাশের মেয়েটিকে কোলে করে তুলে ধরে জড়িত কণ্ঠে গান জুড়ে দিল—আই স ব্লু ওসেন ইন্ হার আইজ। মাটি থেকে শূন্যে উঠে মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে ধরে খিল খিল করে হেসে উঠে এমন ভাবে পা ছুড়তে থাকে যে অশোক সেদিক থেকে চোখ না ঘুরিয়ে পারল না। আনন্দের আতিশয্য আর উদ্দামতা বোধ হয় সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। অন্য মেয়েটি টলতে টলতে মিঃ আকুয়ার পাশের চেয়ারে এসে বসল। কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে বসে রইল। তারপরেই বলল —মাপ করবেন, একটা কথা বলব।

—বলুন। নিস্পৃহ ভাবে মিঃ আকুয়া বলেন।

—উনি কি আপনার বন্ধু? ফরেনার?

—হ্যাঁ। ভারতীয়।

—সো গ্ল্যাড টু মিট য়ু। মেয়েটি অশোকের দিকে হাত বাড়িয়ে তারা দুজনে করমর্দন করল।

—আপনি বোধহয় জানেন, আজ আমরা নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছি, নাইজিরিয়া থেকে আমরা আলাদা হয়েছি। লেট আস সেলিব্রেট বলেই বিয়ারের গ্লাসের সঙ্গে হুইস্কির গ্লাস ঠেকিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা পান করল। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর অশোকের হাত ধরে বলল—ফরেনারদের সঙ্গে আলাপ করতে আমার খু-উ-ব ভাল লাগে।

—থ্যাঙ্ক য়ু।

—অ্যাসুন না আমাদের সঙ্গে, বি ফ্রেণ্ড অফ আস।

—মাফ করবেন, আমরা একটু ব্যস্ত রয়েছি। আকুয়া বলে।

—লিজা।

অন্য ছেলেটি বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এল। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা রীতিমত কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। তাড়াতাড়ি পাশের চেয়ারটা ধরে ফেলল। নইলে হয়তো পড়েই যেত। আরো এগিয়ে এসে লিজার একটা হাত ধরে বলল—চল, এখানে কী করছ।

সুর টেনে টেনে বলল—না আমি যাব না, এরা আমার নতুন বন্ধু।

—লিজা, ডিয়ার।

—ও, নো, নো।

ছেলেটি আর কোন কথা না বলে মুহূর্তে লিজার কোমর জড়িয়ে ধরে প্রায় শূন্যে তুলে ধরে। মেয়েটি নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে সমানে হাত পা ছুঁড়তে থাকে। বুকের বোতাম গুলো খুলে গিয়েছে, গাউনটা কাঁধ থেকে অনেকটা নীচে। হঠাৎ একটা চেয়ারের সঙ্গে

ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে ওরা মাটিতে পড়ে যায়। কাউন্টারের ওধার থেকে হুজন বেয়ারা ছুটে এসে তাদের তুলে ধরতে সাহায্য করে।

—উৎসবের রকমটা দেখছেন মিঃ রয়।

—হ্যাঁ। উৎসব নয়, বরং বলুন উল্লাস।

—তাই। অনেকে নাকি শরীরে বিষ ঢুকিয়ে নেশার মজা উপভোগ করে!

—লাগোসের কোন খবর পেয়েছেন?

—না, অনেক চেষ্টা করেও কোন খবর পাই নি। অনেকক্ষণ লাগোস রেডিও শুনেছি, কিন্তু কেন্দ্রীয়সরকার অদ্ভুত নীরবতা পালন করছেন।

হয়তো অবস্থার পর্যবেক্ষণ করছেন। এরা কতদূর যায় তা' দেখছেন।

—হতে পারে। কিন্তু কোন খবর নেই। আকুয়ার কণ্ঠে বিষাদের সুর স্পষ্ট।

একটু চুপ করে থেকে অশোক আবার বলে—ইবোরা যে খুব খুশি এ বিষয়ে তে কোন সন্দেহ নেই।

—সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। বড় বড় হোটেল-গুলোতে স্পেশাল বল হবে ঘোষণা করেছে। যাবেন নাকি কোথাও মিষ্টার রয়?

—ঠাট্টা করছেন?

—ঠাট্টা কেন? কতরকম নাচ হবে। বল, ক্যাবারে টুইষ্ট, টিপসি। উৎসবের দিনে আনন্দ উপভোগ করবেন, আর যদি কিছু অর্থ ব্যয় করেন, অনেক কিছুই পাবেন। মিঃ আকুয়ার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে। অশোক তার দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে যায়, চোখহুটো জলে ভরে উঠেছে! একটুখানি আবেগের খোঁচা খেলেই গড়িয়ে পড়বে।

ইতিমধ্যে ছেলে হুটো গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে। তাদের

উৎসব পালনের ধারাটা অনেকের মনঃপুত হয়নি। তারা গিয়ে অভিযোগ করতে কর্তৃপক্ষ তাদের বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে সে অনুরোধ প্রত্যাখাত হয়েছে। এ নিয়ে বেশ বচসাও শুরু হয়ে গেছে। বেশ পরিষ্কার ভাবে দু'পক্ষে ভাগ হয়ে গিয়েছে অনেকে। বচসার ভাষা ক্রমশই অসংযত হয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে দু'একজনকে মারমুখী হয়ে উঠতেও দেখা যায়।

—উৎসবের পরিণতিটা দেখবেন না মিঃ রয়?

—খুব উৎসাহ নেই। আচ্ছা মিঃ আকুয়া নাইজিরিয়া থেকে বিয়াফ্রার বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে হৌসা, ইবিবিডো, এফিক এদের প্রতিক্রিয়া কি?

—পরের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজের চোখে দেখা ভাল নয় কি?

—সে তো একশবার সত্যি, তবে চলুন।

—চলুন, দক্ষিণদিকে হৌসাদের বাস, সে অঞ্চলেই যাওয়া যাক।

দু'জনে বেরিয়ে পড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। সর্বত্রই আলোক সজ্জা, কাগজের ফুল, রঙিন পতাকা দিয়ে সাজানো। রাস্তাঘাটে লোকজনের মধ্যেও একটা স্বতস্ফূর্ত আনন্দের ভাব। কোথাও আবার কর্ণেল ওজুকৃয়ুয়ের ছবি টাঙিয়ে পুষ্পার্ঘও দেওয়া হয়েছে। অনেকেই মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রয়েছে সে ছবির দিকে। পুলিশও কেমন একটা নিস্পৃহ ভাবে রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরছে। উৎসব মুখর সহরের মানুষ আজ যথার্থই স্বাধীনতা উপভোগ করছে। অশোক এগিয়ে গেল সিগারেট কিনতে। দোকানটা ছোট। একটু নজর করতেই বোঝা গেল লোকটি হৌসা উপজাতির। সিগারেট নিয়ে দাম মিটিয়ে দেওয়ার পরেও অশোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে অশোকের দিকে তাকায়। তার চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহের ছায়া। জিজ্ঞেস করল—কিছু বলবেন।

কোন রকম ভূমিকা না করে অশোক বলল—নাইজিরিয়া ভাল ছিল, না বিয়াফ্রা।

—বিয়াফ্রা। অত্যধিক জোর দিয়ে লোকটা উচ্চারণ করল। —দেখুন না দোকানটা কী রকম সাজিয়েছি।

সত্যিই সাজিয়েছে। দোকানের মাঝখানে কর্ণেলের একটা ফটো, কাগজের ফুল, রঙিন নিশান। লোকটি নির্বাক হয়ে আকুয়ার দিকে চেয়ে রয়েছে। আকুয়া তাকে জিজ্ঞেস করল—গওন কি খারাপ লোক?

—খদ্দের এসেছে কর্তা, এখন কথা বলার সময় নেই। লোকটি অন্য খদ্দেরের দিকে মনঃসংযোগ করে।

আকুয়া হাসতে হাসতে বলল—চলুন।

দু'জনে আবার জনস্রোতের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা। সকলের মুখে একই আলোচনা বিয়াফ্রার স্বাধীনতা। মধ্যবিত্ত লেখাপড়া জানা-লোকদের আলোচনা একটু এগিয়ে চলে, কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবে এ ঘোষণা গ্রহণ করবেন। অনেকের মনে সন্দেহ হয়তো কেন্দ্রীয় সরকার এমনি ছেড়ে দেবে না, যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, আবার যাদের স্বজাত্যভিমান অনেক বেশী প্রখর তাদের মত, আমাদের খুশি আমরা যুক্তরাষ্ট্রে থাকব না, আমরা আলাদা হয়ে থাকব ওদের কী।

হৌসা পাড়ায় এসে পৌছায় ওরা দুজন। রাস্তায় লোকজন চলাচল কম। তবে রাস্তার ধারের দোকানগুলো সাজান হয়েছে। আর প্রায় প্রত্যেক দোকানেই ঘটা করে ওজুকুয়োর ফটো টাঙানো। দোকানে খদ্দেরপাতি নেই বললেই চলে, শুকনো মুখে হাজার চিন্তার জট মাথায় নিয়ে দোকানদার বসে রয়েছে। আশেপাশের বাড়িগুলোর দরজা জানালা বন্ধ। প্রাত্যাহিক জীবনের উচ্ছলতা নিস্তব্ধ। ডান পাশের অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় ঢুকে তারা অবাক হয়ে গেল। একেবারে নির্জন রাস্তা। খুব বেশী রাত হয়নি, এর মধ্যেই লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। একটা মেয়ে একলা একলা হেঁটে চলেছে রাস্তা দিয়ে। পেছনে মানুষের সাড়া পেয়ে এক নজরে দেখেই

সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। কেমন ভীত সন্ত্রস্তভাব মেয়েটির। তাদের মধ্যে দূরত্ব অনেকটা কমে এসেছে, মেয়েটি আবার চকিতে পিছনে চেয়ে গতিবেগ আরো দ্রুত করে দেয়। নির্জন রাস্তায় শুধ্ ছ-জোড়া পদক্ষেপের অস্পষ্ট শব্দ। উল্টো দিক থেকে আরো একজন মানুষ আসছে। মেয়েটি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়। এবার মেয়েটির মুখ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বয়স বছর কুড়ি বাইশ। ভয়ে মুখ প্রায় সাদা হয়ে গেছে, একবার সামনের দিকে আর একবার তাদের দিকে চাইছে। সামনের লোকটি আরো এগিয়ে এসেছে। তার মুখে আলো পড়ায় তাকে এখন স্পষ্ট চেনা যায়। মেয়েটি পর মুহূর্তে এক দৌড়ে ছেলেটির হাত ধরে সামনের দিকে ছুটতে থাকে। শুধু একটা কথা তাদের কানে ভেসে আসে—বোধহয় ইবো।

হাটতে হাটতে একটা রেঁস্তরার সামনে এসে তারা দাঁড়াল।

ভেতরে তুজনে এসে একটা টেবিলে বসে। খুব বেশী লোকজন নেই, কয়েকটা টেবিল এখনও ফাঁকা রয়েছে। তবে একটাও মেয়ে নেই। সকলেই অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলছে, আলোচনার বিষয় বোঝা যায় না। বেয়ারা এসে টেবিলের ধারে দাঁড়াল। এতবড় চেহারার মানুষটার চোখে অসহায়তার ভাব দেখলে কেমন মায়া হয়।

—তু'কাপ কফি।

অর্ডার নিয়ে চলে গেল বেয়ারা। লোকটা এফিক। তবে কাউণ্টারে যিনি বসে আছেন, তিনি হোসা। চুপচাপ বসে আছেন, মুখে চোখে কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব।

কফি পান করতে করতে আকুয়া জিজ্ঞেস করে—কেমন দেখছেন?

—দেখছি। গম্ভীর হয়ে অশোক বলে।

কিছুক্ষণ আগেই একই সহরের আর একটি অঞ্চল দেখে এসেছে সে। সেখানে জীবনের কী উচ্ছলতা, আর এখানে কী নীরবতা। সেখানে স্ফূর্তির প্রকাশ, আর এখানে প্রাণ রক্ষার তাগিদ।

আকুয়ার পাশের চেয়ারে একজন এসে বসল। লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, বছর ত্রিশেক বয়স হবে, মুখে চোখে বুদ্ধির ছাপ, অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট। বসেই আকুয়ার দিকে তাকাল।

—আরে আপনি? মিঃ আকুয়া তার হাত নিজের হাতে নিয়ে ঝাঁকাতে থাকে।

—পরিচয় করিয়ে দিই ইনি আমার বন্ধু অশোক রয়, ভারতীয় সাংবাদিক; আর ইনি অধ্যাপক রিচার্ড এমেকা ওদিপিয়ো। কিন্তু আপনি এ পাড়ায় কেন?

—এ পাড়ায় বুঝি আমার আসা নিষেধ। অধ্যাপক হাসতে হাসতে জবাব দেন।

—সে কি বলতে পারি। এখনতো গোটা রাজ্যই আপনাদের। হেসে হেসে বলে আকুয়া। মুহূর্তে অধ্যাপকের মুখ কঠিন হয়ে যায়। চোখদুটো নামিয়ে নেয় ক্ষণিকের জন্য। আকুয়া বুঝতে পারে অধ্যাপককে অস্বস্তিতে ফেলেছে সে। তাড়াতাড়ি আবহাওয়া তরল করার জন্য বলে—কোথায় গিয়েছিলেন?

—এখানে কাছেই একটা বাড়িতে, একটু কাজ ছিলো।

—এদিকে সবইতো হৌসাদের বাড়ি, ইবোরা এদিকে আছে কি?

—হৌসাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখা নিষেধ বুঝি?

—না, তা নয়। মুখে আর একটি কঠিন কথা এসেছিল, কিন্তু আকুয়া নিজেকে সামলে নিল।

—শিক্ষিত ইবোদের সঙ্গেও হৌসাদের সম্পর্ক কি তিক্ত?

—সাম্প্রদায়িকতা একবার উস্কে দিলে একেবারে মুছে ফেলা খুব কঠিন।

—তা বটে। তবে ইবো শ্রমিকদের সঙ্গে হৌসা শ্রমিকরা এক সাথে কাজ করে কেন।

বেয়ারা এসে আর এক কাপ কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে অধ্যাপক উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকেন।

—আপনাদের সঙ্গে হৌসাদের সম্পর্ক এখন কী রকম হবে বলে মনে হয় ?

—বোধহয় কোনদিনই সহজ হবে না।

—তা হলে বিয়াফ্রার ভবিষ্যৎ !

—জানিনা। পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে অধ্যাপক একটু চুপ করে থেকে বলে—আজ চলি, পরে দেখা হবে।

অধ্যাপকের গমন পথের দিকে দুজনে চেয়ে থাকে। তার যাওয়ার সহজ দৃপ্তভঙ্গী অশোকের খুব ভাল লাগল। অশোক আকুয়াকে জিজ্ঞেস করে—ইনিও তো ইবো উপজাতির ?

—আপনি কি এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পেলেন না ?

—তাই তো মনে হয়।

—আপনার অনুমান সত্যি। উপজাতীয় কলহ আর সংস্কারের বিরুদ্ধে মুখর, নিজেকে সোস্যালিষ্ট বলে মনে করেন। একটা শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলছেন। একটি সাময়িক পত্রিকা চালান।

—বিয়াফ্রার সৃষ্টিতে বোধ হয় বেদনা বোধ করছেন।

—হতে পারে। তবে সাম্প্রদায়িকতার সমাধান যে বিয়াফ্রা নয় এটা হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছেন।

বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে রেঁস্তরাটা। যারা আছে তারাও হয়তো আর বেশীক্ষণ থাকবে না। দ্রুতবেগে একটা লোক ঢুকেই কাউণ্টারে বসে থাকা—মালিকের সঙ্গে ফিস ফিস করে কী যেন বলল। তার কথা শুনে মালিক বেয়ারাদের ডেকে কী সব নির্দেশ দিলেন। তারা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে টেবিল থেকে কাপ ডিসগুলো ভেতরে নিয়ে গেল। বাইরের শোকেসে যে বোতলগুলো ছিল সেগুলো বের করে ভেতরে রেখে এল। কাউণ্টারের উপর কাঁচের বাসনপত্রগুলো এরমধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব। ঠিক দরজার মুখে দুজন বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

—চলুন, ওঠা যাক।

—হ্যাঁ চলুন, এখানে থেকে আর লাভ নেই।

আবার দুজনে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার মুখে এসে পড়ে।

এখানে লোকজন অনেক। পুলিশের তৎপরতাও বেশী। মাঝে মাঝে সামরিক বাহিনীর লোকজন টহল দিয়ে ফিরছে। মোড়েরমাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা অদ্ভুত গমগমে আওয়াজ অশোকের কানে ভেসে এল। অনেক মানুষ চিৎকার করছে। সেই ঐককণ্ঠ দূর থেকে ভেসে আসছে। বোধহয় মিছিল।

মিছিলটা এগিয়ে এসেছে। সামনেই কর্ণেল ওজুকয়ুর একটা বিরাট ছবি ফুলের মালা দিয়ে সাজান। হাতে হাতে অসংখ্য পোষ্টার আর ব্যানার। দৃপ্তকণ্ঠে স্লোগান দিতে দিতে চলেছে মিছিল। তাদের দুরন্ত পদক্ষেপ মেদিনী কাঁপাতে কাঁপাতে চলেছে। বেশীর ভাগই উত্তর থেকে আসা রেফিউজি। চোখে মুখে উল্লাস আর ক্রোধের চিহ্ন সুস্পষ্ট। অশোক একবার মিঃ আকুয়ার দিকে চেয়ে দেখল। একমনে সিগারেট টানতে টানতে মিছিলটাকে নিরীক্ষণ করছে। রাস্তার দুধারে বহুলোক জমেছে মিছিল দেখার জন্য।

—কর্ণেল ওজুকুয়ু—জিন্দাবাদ

—দেশকে ভাগ করল কে—গওন সরকার আবার কে

—নাইজিরিয়া ভিন দেশ—বিয়াফ্রা আমার দেশ

মোহিত হয়ে বর্ণাঢ্য মিছিল দেখছে অশোক। বেশ বড় মিছিল, অনেক লোকের সমাবেশ হয়েছে। আশে পাশের দোকানগুলো থেকে কৌতূহলী মানুষ মিছিল দেখছে। রাস্তার ধারের বাড়ীগুলোর জানালায় জানালায় মানুষের মুখ। স্বাধীনতা উৎসবের মিছিল। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মিছিল। মিছিলটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছেলের মন্তব্য কানে যেতেই সজাগ হয়ে উঠল অশোক তার সাংবাদিক মন নিয়ে।

—এ ভাবে দেশ ভাগ করা অন্যায়, এ ভাগ মানিনা।

ছেলেটি হৌসা উপজাতীয়। সঙ্গে আরো তিন চারজন রয়েছে।

মিছিল শেষ হয়ে গেছে, ক্রমশঃ তাদের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়। লোকজন একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। যানবাহন চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গের ছেলেটি বলল—না মেনে উপায় কী।

—আমাদের উপর জোর করে দেশবিভাগ চাপিয়ে দেওয়া হল, আমরা প্রতিরোধ করব। তাদের কথাবার্তায় আরো দু-চারজন জমে একটা ছোটখাট ভিড় হয়েছে। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে —এদেশ কী আপনাদের নয় ?

—অখণ্ড নাইজিরিয়া আমার দেশ।

—এই শালা বেইমান। কথা শেষ হবার আগেই লোকটা ছেলেটির নাকে এক ঘুঁষি মেরে দেয়। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ে। লোকটিকে ছেলেটির সঙ্গীরা ঘিরে ধরে কিল চড় ঘুঁষি মারতে থাকে। আরো জনকয়েক ছুটে এসে সে মারামারিতে যোগ দিতেই লোকজন ছুটাছুটি করে পালাতে থাকে।

দোকানগুলোর পাল্লা বন্ধ হতে শুরু করে। জন পাঁচ ছয় সামনের দোকানটায় ঢুকে কোন কথা না বলে দোকানদারকে মুহূর্তের মধ্যে ছুরিকাহত করে জিনিষপত্র লুঠ করে নিয়ে যায়। রাস্তার আলো নিভে ঘুটঘুটি অন্ধকারে মানুষের জীবন আরো বিভীষিকাময় করে তোলে। দূর থেকে ভয়ার্ত মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে। প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে হৌসারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। হাঙ্গামা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে বলেই মনে হয়। আরো অনেক ইবো এপাড়ায় এসে বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—এখানে থাকা আর নিরাপদ নয় মিঃ রয়। চলুন ওদিকে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ি। এই অন্ধকারে থাকা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

—শীগগীর চলুন, পেছনে ভীষণ গোলমালের শব্দ ভেসে আসছে।

দ্রুত হাঁটতে থাকে তারা। একটা গলির মধ্যে ঢুকে মনে হল যেন আরো বোকামি হয়েছে। খাঁ খাঁ করছে নির্জন রাস্তা। একটু

এগিয়ে যেতে দেখে একটা লোক মাটিতে পড়ে রয়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা, লোকটা ছটফট করছে।

—একটু দাঁড়ান মিঃ আকুয়া, লোকটা এখনো বেঁচে রয়েছে।

—কি করবেন অপনি, শীগগীর পালান। গোলমাল বেশ ভারী রকম হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

—হাসপাতালে পাঠালে লোকটা হয়তো বাঁচতে পারে।

—সময় নেই মিঃ রয়, নিজেকে আগে বাঁচাতে হবে।

—লোকটা তবে মরে যাবে ?

—জানি না।

আকুয়া ছুটতে আরম্ভ করেছে। আর কোন উপায় না দেখে অশোকও ছুটতে আরম্ভ করে। দূর থেকে অসংখ্য মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে। ছুটতে ছুটতে গলিটার মুখে এসে থমকে দাঁড়াল তারা। সম্মুখের বাড়ীটার দরজা হাঁ করে খোলা রয়েছে, দরজার সামনে চোদ্দ পনেরজন ছেলে হল্লা করছে, দু'একজনের হাতে অস্ত্রও রয়েছে। রাস্তার ওপর প্রচুর জিনিষপত্র স্তূপাকৃত করে রাখা হয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়ী থেকে কোন মানুষের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই পালিয়ে গেছে না মরে গেছে কে জানে। এই দৃশ্য দেখেই ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ে আকুয়া। তাড়া খাওয়া কুকুরের মত এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা ছুটে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছে। কোনদিকে যাওয়া নিরাপদ বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়ায় তারা।

—একটা ট্যাক্সি দেখুন মিঃ আকুয়া।

—এই গণ্ডগোলের মধ্যে ট্যাক্সি কোথায় পাবেন ? কোন হৌসা ট্যাক্সি ড্রাইভার যেতে রাজি হবে না। আর ইবোদের ট্যাক্সি চড়া মোটেই নিরাপদ নয়।

—তবে ? চিন্তিত হয়ে ওঠে অশোক।

—কিছু মনে করবেন না মিঃ রয় একটা কথা বলি।

—বড় রাস্তায় হয়তো পুলিশ পাওয়া যেতে পারে, আপনি

বিদেশী আপনাকে কিছু বলবে না, পুলিশের সাহায্য নিয়ে হোটেলে চলে যান।

—আর আপনি?

—যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেব। আমার সঙ্গে থেকে কেন শুধু শুধু বিপদে পড়বেন।

—সে হয় না মিঃ আকুয়া, যা হবে দুজনেই একসঙ্গে মোকাবিলা করব। আর তাছাড়া আপনি তো হৌসা নন।

—মানুষ অমানুষ হয়ে গেলে মারাত্মক জীব হয়ে ওঠে মিঃ রয়। আপনি আমার কথা আর একবার ভেবে দেখুন।

—সে হয় না চলুন এগিয়ে দেখি।

আবার তারা দুজনে যেতে শুরু করে।

দুম্ দুম্।

গুলির আওয়াজ না টিয়ার গ্যাস। বোধহয় পুলিশ এসেছে। হয়তো এখুনি অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে এসে পড়বে। আবার আওয়াজ হল। টিয়ারগ্যাস শেল ফাটার শব্দ। অনেক লোক দৌড়ানর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আবার দৌড়তে শুরু করে। বড় রাস্তা পার হয়ে এবার দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। অন্ধকারে লোকজন আছে বলে মনে হয় না। ভোঁ করে একটা পুলিশের গাড়ী বেরিয়ে গেল। বড় রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে যেতেই মনে হল দূর থেকে একটা লোক ছুটে আসছে। চট করে দু'জন দুদিকে দাঁড়িয়ে গেল। যদি আক্রমণ করে অন্ততঃ নিজেদের রক্ষার জন্যও দু'পাশ থেকে প্রতি আক্রমণ করতে পারবে। নিঃসীম অন্ধকারে নির্জন পথে প্রতিটি মুহূর্ত্তকে অনন্ত কাল বলে মনে হয়। লোকটা আরো এগিয়ে এসেছে। তারা দুজন আরও সতর্ক হয়ে ওঠে। কাছে আসতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটি মেয়ে। বছর বাইশ তেইশ হবে। ভীষণভাবে ভীত। বারবার তাদের দুজনের দিকে চেয়ে শেষ পর্যন্ত হাতের মুঠোয় প্রাণটুকু নিয়ে ছুটে এসে বলল—রক্ষা করুন। পেছনে গুণ্ডা তাড়া করেছে।

মেয়েটি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার নিঃশ্বাস জনহীন পথের মাঝে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। কিছুক্ষণ আগে বাড়ী থেকে বের হয়েছিল। পথে হাঙ্গামা লাগতেই ফিরে যায়। কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছুতে পারে নি, সেখানে ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে কাছাকাছি পরিচিত এক বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া স্থির করে। পথে গুণ্ডার তাড়া খেয়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়েছে।

—মিঃ রয় ছুটুন। শীগগীর! গুণ্ডারা এখুনি এসে পড়বে।

এবার তারা তিনজনে ছুটতে শুরু করে। কতক্ষণ ছুটেছিল জানেনা, কিন্তু এবার যে রাস্তায় এসে পৌঁছাল সেখানে আলো জ্বলছে। দু'একজন লোকও চলাফেরা করছে। পাশ দিয়ে দ্রুত একটা ট্যাক্সি ছুটে গেল।

—এখানে হয়তো ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে।

—হ্যাঁ। কিন্তু একে নিয়ে যাব কোথায়?

—আগে কোন নিরাপদ জায়গায় চলুন, তারপর চিন্তা করা যাবে। এখন কিছুই ভাবতে পারছি না, মাথা ঝিমঝিম করছে।

—মাপ করবেন, আপনার নাম জানতে পারি কি?

—ডোরা ওয়াম্বা।

—কোথায় যাবেন?

—জানি না, যে কোন জায়গায় নিয়ে চলুন প্লিজ।

—হেঁটে যেতে কষ্ট হবে না আপনার?

—কোন কষ্টকে গ্রাহ্য করি না। শুধু আমার সম্মানটুকু নষ্ট না হলেই হল।

একটা ট্যাক্সি পাশ দিয়ে যেতেই চিৎকার করে থামিয়ে দিল।

—মিঃ রয়, এবার আপনি চলে যান।

—কোন ভয় নেই মিঃ আকুয়া আসুন। যা হয় হবে।

মেয়েটিকে পেছনের আসনে শুইয়ে দেওয়া হল, যাতে বাইরে থেকে না দেখা যায়। সামনে তারা দুজন বসে। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে

খুব জোরে। যেতে যেতে তারা দেখল আশেপাশে হাঙ্গামার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। মাঝে মাঝে হল্লার উৎকট শব্দ ভেসে আসছে। আরো কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখল রাস্তায় আগুন জ্বলছে। ট্যাক্সিটা কাছে আসতেই পাঁচ ছ'জন ছেলে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিটা থামিয়ে দিল। গাড়ীটা থামতেই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল তারা। একজন কাছে এগিয়ে এসে গাড়ীর ভেতর নজর করে জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছেন আপনারা ?

অশোক হোটেলের নাম ও নিজের পরিচয় জানাল।

—আর এই লোকটা ?

—আমার সহকারী আফ্রিকান।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। পেছনের সিটে কে উনি ?

—আমার সঙ্গী, খুব অসুস্থ।

—বেরিয়ে আসতে বলুন, দেখতে চাই।

ট্যাক্সির মধ্যে সকলেই উঁকিঝুঁকি মারছে। ওদের মধ্যে একজন একটু বেশী সাহসী, পেছনের দরজা খুলে এক ঝটকায় ডোরাকে বের করে আনতেই বিকট সুরে একটি চিৎকার ধ্বনিত হল—হোসা…।

ডোরা থরথর করে কাঁপছে, তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। সম্মুখে কোন এক হতভাগ্য হোসা ড্রাইভারের ট্যাক্সি দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই বহ্নির রক্তাভায় কৃষ্ণকায় মূর্তিগুলো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তাদের পৈশাচিক উল্লাসের সামনে একজন নারী অপমানে মিয়মান। অশোকের সঙ্গে সঙ্গে আকুয়াও ট্যাক্সি থেকে নেমে এল। সমস্ত অবস্থা নিরীক্ষণ করে অশোক বুঝল যে জোর করে কোন লাভ নেই। এতগুলো উন্মত্ত যুবকের মাঝখানে এদের রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।

—আপনি চলে যান, ট্যাক্সিতে উঠুন। একজন হুকুম করে।

—আর ওরা।

—ওদের ব্যবস্থা আমরা করব।

অশোককে জোর করে ট্যাক্সির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ডোরা আর আকুয়াকে ওরা ঘিরে রয়েছে। ড্রাইভারের পাশে একজন এসে বলল—এখুনি স্টার্ট দাও নইলে সামনের গাড়ীটার অবস্থা হবে। পেছন থেকে তীব্র সার্চলাইট এসে পড়েছে। ছেলেগুলো হতচকিত হয়ে আলোর দিকে চেয়েই সোজা দৌড়তে শুরু করল। ছুটো পুলিশের ট্রাক এসে থামল। পাঁচ সাতজন পুলিশ ট্রাক থেকে নেমে সামনের দিকে ছুটে এল। একজন অফিসার এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল তারা কোথায় যাবে। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের যেতে অনুমতি দিল।

এতক্ষণে নিরাপদ এলাকায় এসে পৌঁছেছে। এখানকার জীবন-যাত্রা স্বাভাবিক। সহরের আর এক কোণে যে তাণ্ডব হয়ে গেছে বোধহয় তার সামান্য হাওয়ায় এদিকে এসে পৌঁছায়নি। মোড়ে মোড়ে মানুষের জটলা। গুজব আর অবিশ্বাস্য কাহিনী পল্লবিত হয়ে এসে পৌঁছেছে এখানে। অনুচ্চকণ্ঠে অশোক আকুয়াকে জিজ্ঞেস করে—ডোরাকে কোথায় নিয়ে যাব।

—এদিকে ওর কোন আত্মীয়স্বজন আছে কিনা জিজ্ঞেস করি।

পিছনে মাথা রেখে হতচেতনের মত ডোরা বসেছিল। অশোকের ডাকে চোখ খুলে খুব ধীরে ধীরে বলল সামনেই একটা ক্যাথলিক চার্চ আছে, সেখানে তাকে নামিয়ে দিতে।

চার্চের সামনে ট্যাক্সি থামল। ডোরা কম্পাউণ্ডের গেটের মধ্যে প্রবেশ করে আবার পেছন ফিরে চাইল। ধীরে ধীরে বলল—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দয়া করে আর একটু উপকার করুন আমার। এই ঠিকানায় অধ্যাপক ওদিপিয়োকে খবর দেবেন সে আমি এখানে আছি।

অধ্যাপকের নাম শুনে অশোক ডোরার দিকে চাইল। পুরু

ঠোঁট দুটোর মধ্যে এক চিলতে হাসি আটকে রয়েছে। তার এই সলজ্জ হাসিটুকু ভারী ভাল লাগল অশোকের।

বেশ রাত হয়েছে, প্রায় নিঝুম হয়ে গেছে হোটেল। ঘরে আসবার সময়ই দুকাপ কফির অর্ডার দিয়ে আসে অশোক। ঘরে ঢুকেই ক্লান্তিতে দেহ এলিয়ে দেয়।

পাশের ঘরটা এতদিন বন্ধ ছিল, আজ আলো জ্বলছে, মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। দু'জন আমেরিকান এসেছেন।

ডেক চেয়ারে মিঃ আকুয়া শরীরটা এলিয়ে দিল। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে। এই কয়েকঘণ্টার উত্তেজনায় সারা শরীর অবসাদে ভেঙ্গে পড়েছে। অশোক বড় আলোটা নিভিয়ে বেড-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল।

—হাতের কাছে কোন জ্যোতিষী পেলে বিয়াফ্রার জন্মলগ্ন জেনে নিতাম।

—আপনারা তো আবার ওবিদ্যায় বিশারদ।

—অবশ্য আমি কিছুই জানি না।

—না জানলেও অনুমান তো করেছেন।

—শুধু অনুমান করলেই হবে না, এর কুলুজি জানতে হবে।

—কুলুজি জানতে হলে অনেক পেছু হটতে হবে। শুধু আজকের বিয়াফ্রার নয়। পিতৃপুরুষ নাইজিরিয়ারও ইতিহাস জানা চাই।

পুরানো ইতিহাসের বিবর্ণ পাতা উল্টেপাল্টে দেখতে হবে নাইজিরিয়াকে। উপজাতীয় কলহ, সাম্প্রদায়িকতা, ঘৃণা আর বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে যে বিয়াফ্রার সৃষ্টি তার পেছনে রয়েছে নাইজিরিয়ার কলঙ্কময় এক একটি অধ্যায়। সে অধ্যায়কে জানতে হলে, অনেক অনেক পেছু হটতে হবে।

॥ দুই ॥

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ গিনি উপসাগরে একটি অর্ণবপোত এসে নোঙ্গর করল। বালুকাময় তীরভূমি তরঙ্গাঘাতে ভগ্নপ্রায়। নেমে এল একজন ভাগ্যান্বেষী। দেশে থাকতে দিনের পর দিন শুনে এসেছে সমুদ্রপারে রয়েছে এক আশ্চর্য দেশ। সেখানকার বালুকারাশি স্বর্ণমণ্ডিত। অসীম নীলসাগরের তীরে লুব্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখেছে দূরে, অনেক অনেক দূরে কেমন একটা ছায়া-ছায়া মূর্তি হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

মাটিতে নেমে উজ্জ্বল সূর্যালোকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল যুবক। আর একজন নিঃশব্দে তার পাশে এসে ধীরে ধীরে কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে ডাকল—জন।

জন কোন উত্তর না দিয়ে মুগ্ধ নয়নে সম্মুখের দিকে চেয়ে রইল। কয়েক হাজার মাইল দূরে ইংল্যাণ্ড, সেখান থেকে অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে এসেছে। এখানকার আকাশে বাতাসে ধুলোর সঙ্গে টাকা উড়ে বেড়ায় শুধু। ধরতে জানা চাই। হাতির দাঁত, কাঠ, বাদাম তেল, মধু আর রয়েছে তাজা রক্ত! তাজা কালো মানুষ! নতুন পৃথিবীতে অনেক মানুষের দরকার।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে য়ুরোপীয় অভিযাত্রীরা আফ্রিকার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর লুব্ধ হয়েছে তার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ দেখে। বেওয়ারিশ মৃতদেহের ওপরে অসংখ্য শকুনি ঝাঁক বেঁধে মড়াটাকে যেমন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, তেমনি করে পর্তুগীজ, ফরাসী, ডাচ, জার্মান, স্পেনীশ, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ গোটা আফ্রিকাকে ছিন্নভিন্ন করে নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে।

নাইজার নদীর তীরভূমিতে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছে

ডাঃ গ্রুপার, ক্যাপটেন ডেকুয়র, কর্ণেল গ্যালেনি, ক্যাপটেন ডেলানিউ। তারা য়ুরোপবাসীকে শোনালেন এক অপরূপ রূপকথা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই ভাগ্যান্বেষণে।

জাহাজ থেকে নেমে জন এসে উপস্থিত হয় রিচার্ডের অফিসে। রিচার্ডের এক আত্মীয়ের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, সেই সূত্র ধরে এখানে আসা। রিচার্ড তাকে বেশ খাতির করেই অভ্যর্থনা জানাল। তারপর নিয়ে গেল এক উপজাতীয় সর্দারের কুড়ে ঘরে।

একটা কাঠের গুঁড়ির ওপরে বসে রয়েছে সর্দার। দুজন নিগ্রো তার বিরাট পা দুটো টিপছে। রিচার্ড এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে পরিচয় করিয়ে দিল—আমার বন্ধু।

হা হা হা! বিকট হাসিতে বনভূমি কেঁপে উঠল। হাসির প্রচণ্ডতায় ছুটে এল তার স্ত্রী কন্যা। জন নজরানা হিসেবে খুলে ধরল খাঁটি বিলিতি মদ। ঢক্ ঢক্ করে এক সঙ্গে আধবোতল গলায় ঢেলে, চোখ দুটো কুঞ্চিত করে জিনিসটার তারিফক রল—আঃ! তার স্ত্রীর দিকে একটা রঙিন ঝলমলে সিল্কের স্কার্ফ তুলে ধরতেই সে ছোঁ দিয়ে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গালে ঘষে ঘষে উল্লসিত হয়ে উঠল। ঘাড় কাত করে মেয়েটি এতক্ষণ মুগ্ধ নয়নে জনের দিকে চেয়েছিল। তার গলায় একছড়া পুঁতির মালা পরিয়ে দিতেই চোখ দুটো তার চিকচিক করে উঠল। লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি। পরক্ষণেই আবার ফিরে এল হাতে দুফুট-আড়াই ফুট লম্বা একটা হাতির দাঁত। জনের দিকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এগিয়ে দিল।

—সর্দার আমার বন্ধুর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—পরে দেখা যাবে। এখন ভাগ।

—কতজনকে এখন পাওয়া যাবে সর্দার।

—আঃ মৌজ নষ্ট করো না। বলছি তো পরে দেখা যাবে।

—বাবা, এই সাহেবটা খুব ভাল। মেয়েটি ধীরে ধীরে বলে।

জন পকেট থেকে একটা পেতলের চেন শূন্যে তুলে ধরতেই মেয়েটির লোভাতুর দৃষ্টি অস্থির হয়ে ওঠে।

জন অভিভূত হয়ে সব কিছু দেখছে। অসীম আগ্রহ নিয়ে সে অপেক্ষা করছে তার ভাগ্যের লিখন জানবার জন্য। সর্দারের বিরাট দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গা কেমন শিরশির করে ওঠে, চোখ ফিরিয়ে নেয়। মেয়েটি তীক্ষ্ণ নজরে তাকে নিরীক্ষণ করছে। চোখাচোখি হতেই ফিক্ করে হেসে ফেলে। রিচার্ড বুঝল আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। একবার যখন বলেছে রাত্রে যেতে তখন পায়ে হাজারবার মাথা খুঁড়লেও সে কথার অন্যথা হবে না।

হুম্ হুম্ হুম্। একটা অদ্ভুত শব্দ হতেই তারা পেছন ফিরে চাইল।

অনেক লোক এক সঙ্গে এসে হৈ হৈ করতে করতে জায়গাটা ভরে ফেলল। তাদের সঙ্গে রয়েছে পাঁচ ছটি কুকুর, ঘেউ ঘেউ করে গোটা পাড়া মাত করে রেখেছে। দুজন লোকের হাত পেছনে বাঁধা। একটা কাঠের গুঁড়ির দুধার তাদের গলার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। লোকদুটো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে রীতিমত ধুকছে।

তাদের দেখেই সর্দারের চোখ ধ্বক ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল। ভাঁটার মত লাল চোখ দুটো পাকিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। সে হাসির তীব্র ছুঁচলো হাওয়া সোজা লোকদুটোর প্রাণে গিয়ে বেঁধে। দিন পাঁচসাত আগে তাদের ধরে নিয়ে আসা হয়েছে নাইজার নদীর উপকূল থেকে। অনেক চেষ্টার পর পরশুদিন রাতে পালিয়েছিল। সকাল বেলায় তাদের পলায়ন সংবাদ পেয়ে দিকে দিকে পাঠান হল লোকজন। কিন্তু এত চেষ্টা করেও অনেক শ্বাপদ জন্তুর হাত থেকে রেহাই পেলেও মানুষের হাত থেকে নিস্তার পেল না এই মনুষ্যত্বের জীবদুটি।

—কি রে কোথায় গিয়েছিলি? বলেই সর্দার এক লাথি কষিয়ে দিল সামনের লোকটার পেটে।

কোঁক শব্দ করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন

এসে তাকে তুলে ধরল। সর্দারের হাতের সামনে একটা চাবুক এগিয়ে দিল একজন। অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে সর্দার বার কয়েক চাবুক চালাল লোকটির পিঠে।

—আর যাবি ?

—না, না সর্দার তোর পায়ে পড়ি। যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকে লোকটা। জন নির্বাক হয়ে এই পৈশাচিক লীলা দেখতে থাকে। হঠাৎ দ্বিতীয় লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়তেই জন দেখল একজন পেছন থেকে তার কোমরে মারছে লাঠির বাড়ি। পাশের বর্শাটা নিয়ে শুধু একটা খোঁচা দিতেই লোকটা চিৎকার করে গড়াগড়ি দিতে থাকে।

—শালারা নেশাটা নষ্ট করে দিল। দে সাহেব, আর একটু দে।

রিচার্ড তাড়াতাড়ি আর একটি বোতল এগিয়ে দেয়। ঢক ঢক করে ঢেলে দিল সর্দার নিজের গলায়। হাত দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল রাতে আসিস, এখন মেজাজ নেই। আরো মদ আনিস।

রাতে গিয়েছিল জন। সিল্কের রুমাল, কাঁচের চকচকে জিনিস, পুঁতির মালা, পেতলের চেন, চাকতি আর বিলিতি মদ দিয়ে সওদা করল একরাশ হাতির দাঁত, আবলুস কাঠ, বাদাম, তেল, মধু আর তাজা রক্ত, তাজা মানুষ।

ব্যবসা দিনে দিনে বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠল। অসমসাহসী জন আরো নতুন নতুন দিকে যাত্রা সুরু করেছে, গ্রামে গ্রামে ঢুকে সরাসরি জিনিস কিনলে লাভ আরো বেশী। কালো আবলুস কাঠ আর হাতি দাঁতগুলোর দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু নিজেকে সামলানো দায় হয়ে ওঠে মানুষ কিনতে গিয়ে।

শীগগীর একটা জাহাজ ছাড়বে। জন ব্যস্ত হয়ে ওঠে বড় রকমের রপ্তানির জন্য। আরো অনেক সামগ্রী জোগাড় করে রাখতে হবে।

একটা জায়গায় ভিড় দেখে সে থমকে গেল। বেশ শক্ত সামর্থ

একটি ছেলে বিক্রি হবে। অনেকেই তার হাত পা পরখ করে দেখছে। দুএকজন দাম দিয়েছে। সে আরো একটু দাম বাড়িয়ে দিল। এপাশে আরো জনকতক মাথা নীচু করে বসে রয়েছে। প্রত্যেকের পায়ের সঙ্গে আর একজনের পা বাঁধা। ধীরে ধীরে জন এগিয়ে গেল সেদিকে। তার চোখে লেগে গেল ছেলেটি। খালি গায়ে কোমরে একফালি কাপড় জড়ানো। পিঠের ওপরে এক থাবা মেরে বলল, দেখতো হ্যারি এই শুয়োরটা কেমন হবে।

হ্যারি তার পায়ের একটা গোছা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল—ভাল দাম পাওয়া যাবে। তবে এটা যেন হাত ছাড়া না হয়।

—কিন্তু মঁসিয়ে পিয়ের কেমন মুখিয়ে আছে দ্যাখ, সব জিনিসেরই দাম চড়িয়ে দিচ্ছে। ঐ শালার জন্য আর ব্যবসা করা যাবে না।

—আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। ইংল্যাণ্ডে খবর গেছে গোটা নাইজিরিয়া আমাদের কব্জায় এল বলে। ব্রিটানিয়া রুলস্ দ্য ওয়েভস্, সুর করে বলে ওঠে জন।

—মনে রেখ আমরা ব্যবসা করতে এসেছি। সৎভাবে ব্যবসা করে কিছু সম্পদ নিয়ে দেশে চলে যাব। তারপর সেখানে বিয়ে থা করে আরামে সংসার করা যাবে, কি বল? দুজনে হো হো করে হেসে ওঠে।

মনের এক কোণে আশার এক চিলতে আলো জ্বলে ওঠে। দেশে যখন ফিরে যাবে অগাধ সম্পদের মালিক হয়ে।

ততক্ষণে জনের চোখ পড়েছে এদিকে। চারপাঁচটা মেয়ে মাথা নীচু করে বসে রয়েছে। প্রত্যেকের পায়ের সঙ্গে প্রত্যেকের পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সাহেবদের আসতে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তারা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ায়। নাইজিরিয়ার অরণ্য-হরিণীর মত চকিত হয়ে ওঠে। জন কাছে এসে নীরবে হাসে। পেছন দিক থেকে একটা মেয়েকে চাপড় দিয়ে একটু আদর করে। গোটা শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে মেয়েটির। তারা আরো ঘননিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

—ব্যবসা ভালই হচ্ছে মনে হয় মিঃ জন।

—তোমার মত নয় মঁসিয়ে পিয়ের।

—কেন? এই তো বেশ ঘোরাফেরা করছ।

—এই নোংরা অসভ্য নিগ্রোগুলোকে দেখলে আমার গা শিরশির করে।

—কিন্তু গায়ে গা ঘষতে অদ্ভুত মিষ্টি লাগে।

জনের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। পিয়ের আর কোন কথা না বলে এগিয়ে যায়।

পালাও! পালাও! সাহেব আসছে। গোটা অঞ্চলটায় একটা সারা পড়ে গেছে। অর্ধ-নগ্ন মানুষগুলো ভীরু শশকের মত গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে ফিরছে। প্রথম প্রথম তারা সাহেব দেখলে দূর থেকে তীর ছুড়ে মেরেছে। কিন্তু সাহেবদের লম্বা লম্বা ধনুকগুলো অদ্ভুত। দুম করে একটু শব্দ হয়, আর অব্যর্থ আগুনের গোলা এসে বুক ফাটিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দেয়।

—আশ্চর্য একটাও মানুষ নেই! সব পালিয়েছে। চল ঐ জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকে পড়ি।

—তারপরে কোথা থেকে একটা তীর এসে এফোড় ওফোড় করে দেবে।

—তুমি হাসালে দেখছি। হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বলে এটা রয়েছে কী করতে। একটা ফায়ার করলেই সব ভেড়ার মত পালাবে, তখন একটি মাত্র বুলেট খরচ করলেই গোটা শুয়োরের দলটা ধরা পড়বে।

—কিন্তু আর বেশী হাঁটতে পারছি না। একটু বিশ্রাম করা দরকার।

—তা বটে, কিন্তু এখনো যে কিছুই জোগাড় হল না। জন একেবারে রেগে যাবে।

—ধুৎত্তোর এ শালার দেশে এসে জান কয়লা হয়ে গেল।

—আহা, দেশে থেকেই বা কী হচ্ছিল, রোজগার পাতি নেই, না খেয়ে, মরার জোগাড়। এখানে তবু খেয়ে পরে রয়েছ, কিছু জমছেও। হো হো করে হেসে ওঠে দু'জন।

—আচ্ছা তুমি এগোও আমি বিশ্রাম না করে আর পারছি না।

সঙ্গী চলে যেতেই পকেট থেকে হুইস্কির বোতল বের করে গলায় ঢেলে দিল জন। গলাটা জ্বলতে জ্বলতে পেট পর্যন্ত গিয়ে শরীরের গ্লানি অর্ধেকটা কেটে গেল। বোতলটা চোখের সামনে তুলে ধরে দেখে এখনো অর্ধেকটা রয়েছে। আবার গলায় ঢেলে দিল। এবার শরীরটা বেশ লাগছে। এই জঙ্গলের মধ্যে একা একা দাঁড়িয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বরফ ছাওয়া সাদা এক ভূখণ্ড। বাদলা হাওয়ায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কতদিন গেছে। এমন কি পেটের ভাতটুকু জোটাতে কী মেহনতই না করতে হয়েছে! দূর ছাই, তার চেয়ে এ ঢের ভাল।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সঙ্গী যে দিকে গেছে সেদিকে হাঁটতে শুরু করে দেয়। ক্লান্ত পদক্ষেপে পায়ের নীচের শুকনো পাতাগুলো মড়মড় করে ওঠে। ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। আফ্রিকার মাটিতে কোন য়ুরোপীয় সাহেব ভ্রূক্ষেপ করতে শেখেনি।

আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়াল সে। পর পর কতগুলো পাতায় ছাওয়া নিগ্রো কুটীর। জন মানুষের চিহ্ন নেই। প্রথম ঘরটায় গিয়ে উঁকি দিয়েই ফিরে আসে। আর একটা ঘরে যায়। দোর গোড়ায় পৌঁছে হতভম্ব হয়ে গেল সে। মেঝের ওপরে অর্ধ উলঙ্গ একটা মানুষ শুয়ে রয়েছে। নারী!

চোখ মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু করে। ধমনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্তস্রোত। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, কান দুটো দিয়ে উত্তেজনার লাভা ছুটে বের হচ্ছে। মাথা উঁচু করে বসে থাকতে পারছে না, গোটা পৃথিবী ঘুরছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটি এক দৌড় দিল। আর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জন। উত্তপ্ত মাংসল দেহটা নিজের দেহের মধ্যে পিষে ফেলেও কামনায় জর্জরিত মনকে প্রশমিত করতে পারে না। বার বার বাঘের মত থাবা মেরেও শান্ত হয় না এই পশু দেহটা। যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল তখন অবসাদে তার দেহ ভেঙ্গে পড়ছে।

কিছুটা এগিয়ে আসার পরও যখন সঙ্গীর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না, তখন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে নিজের অবস্থানের কথা জানাল। কোনও প্রত্যুত্তর না পেয়ে আবার এগিয়ে চলল জন।

একটা ঝোপের কাছে এসে তার চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। শক্ত সমর্থ চারটে জোয়ান মরদ। সঙ্গীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল। আহা কি কাজের ছেলে।

হাত বাঁধা নিগ্রোগুলো শ্লথ গতিতে হেঁটে চলেছে। একজনের সঙ্গে আর একজন বাঁধা। বন্দুক উঁচিয়ে পাশে পাশে চলছে তার সঙ্গী, পালানোর চেষ্টা করলেই মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।

দিনে দিনে দাস ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে। বাণিজ্যসামগ্রী বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এখানে অসংখ্য মজুরের প্রয়োজন দেখা দিল। কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের ওপর নিপীড়ন দেখে ইংলণ্ডের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো। দাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে দাসপ্রথা বিলোপ হ'ল। আফ্রিকায় য়ুরোপীয়দের নিগ্রো অভিযান দেখে কার্লমার্কস বললেন 'a game reserve for hunting negroes'।

ইংরেজ বণিক কুঠীর স্বর্ণযুগে এলেন স্যর জর্জ গোল্ডি। পরবর্তীকালে দক্ষিণ নাইজেরিয়ার অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি থেকে প্রভূত সম্পদ আহরণ করেছিলেন তিনি। লোভাতুর বণিকের থাবা নতুন অভিযানে অগ্রসর হ'ল। স্বার্থের সংঘাত দেখা দিল অনিবার্য রূপে। ফরাসী আর ইংরেজদের এই সংঘাতের দিনে জর্জ গোল্ডি স্বপ্ন দেখলেন ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের। শ্বেতবস্ত্র পরিহিত খৃষ্টান মিশনারীরা ছুটে

এলেন। খৃষ্টের পুতপবিত্র শান্তির ললিত বাণী শুনিয়ে দিলেন নিগ্রোদের আত্মা উদ্ধারের জন্য। মিশনারীদের অক্লান্ত চেষ্টায় স্থানীয় য়ুরোপ উপজাতি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে ইংরেজদের ভূমি প্রস্তুত করে দিল। জর্জ আবেদন জানালেন গ্ল্যাডস্টোন সরকারের কাছে। ষ্ট্যানলি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে নাইজেরিয়ার দক্ষিণ পূর্বে কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে। এখানকার মাটিতে সোনা। বিস্তার কর সাম্রাজ্য। অক্ষয় হয়ে উঠুক ব্রিটিশের দুন্দভি। ষ্ট্যানলি আবেদন করলেন গ্ল্যাডস্টোনের কাছে। কিন্তু এই উদারনৈতিক সরকার উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী নয়। প্রত্যাখান করলেন সব রকম প্রস্তাব। ষ্ট্যানলি বিফল হয়ে গেলেন বেলজিয়ামের রাজার কাছে। জর্জের নেতৃত্বে ইংরেজ বণিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ফরাসীদের বাধা দিতে সুরু করেছে। জার্মানীদের উকিঝুঁকি রোধ করে সাগরতীরবর্তী নাইজিরিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা হল।

বিসমার্কের নেতৃত্বে বার্লিনে য়ুরোপীয় শক্তির মিলিত সভা বসল আফ্রিকাকে ভাগ-জোক করে নেবার জন্য। জর্জ আমন্ত্রিত হল সেই সভায়। কঙ্গো লাভ হল বেলজিয়ানদের, জার্মানী পেল ক্যামেরুণ, ব্রিটিশ অধিকার পেল নাইজার নদী পর্যন্ত একাধিপত্য করার।

ইতিমধ্যে ন্যাশনাল আফ্রিকান কোম্পানী, বা পরবর্তীকালের রয়াল নাইজার কোম্পানী গঠিত হয়েছে। বণিকের মানদণ্ড রাতের আঁধার পেরুনোর পর রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। কোম্পানী শুল্ক আদায় করতে শুরু করল। চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় পবিত্র শ্বেতশুভ্র বস্ত্র পরিহিত ফাদার। তাদের সঙ্গে রয়েছে পবিত্র যীশুর বাণী।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজ সরকার সৈন্যাধ্যক্ষ স্যর ফেডারিক লুগার্ডকে পাঠান নাইজিরিয়ায়। বিশ শতকের গোড়া থেকেই দক্ষিণ নাইজিরিয়া ইংরেজের উপনিবেশ, এ্যাংলো ফরাসী শর্ত অনুসারে।

লুগার্ড লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন উত্তর দিকে। বিস্তৃত নাইজার নদী অতিক্রম করে রয়েছে যে বিশাল ভূখণ্ড সে তাকে হাতছানি

দিয়ে ডাকছে। লেডী লুগার্ড দেশটার নাম দিয়েছেন নাইজিরিয়া। লাগোসে থাকতে থাকতে তিনি পাদ্রী পাঠিয়ে দিলেন। শান্তির ললিত বাণী শুনে তারা শান্ত হোক। বহুকাল ধরে সেখানে ফুলানি সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকের গোড়ায় ইসলামের সাম্যের বাণী শোনাতে এসেছেন হৌসা রাজ্যে উসমান দান ফদিও। ফদিও পণ্ডিত ব্যক্তি। এক হাতে কৃপাণ আর এক হাতে কোরাণ নিয়ে তিনি জেহাদ ঘোষণা করলেন হৌসাদের বিরুদ্ধে। দিনের পর দিন ফুলানি সাম্রাজ্য ক্রমশঃ উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত হতে হতে কাবা লাইন পর্যন্ত এসে ব্রিটিশদের কাছে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল। উত্তরের এই বিশাল ভূখণ্ড আর বিপুল জনসংখ্যা এমিরদের অত্যাচারে অধীর হয়ে উঠলো। এই সুযোগ গ্রহণ করে লুগার্ড একটার পর একটা রাজ্য জয় করতে থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো একত্র করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। অবশ্য একদিনে সমাধা হয়নি এ সাম্রাজ্যের পত্তন কিংবা বিনা বাধায় গড়ে উঠেনি ইংরেজদের উপনিবেশ। লুগার্ড অগ্রসর হতে গিয়ে প্রচণ্ড বাধা পেলেন সকোতোর সুলতানের কাছ থেকে। কিন্তু ইংরেজদের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে পরাভূত হল তাদের কৃপাণ। লুগার্ড রাজ্য জয় করেও স্থানীয় সর্দারের হাতেই শাসনভার রেখে দিলেন। পরোক্ষে চলল ইংরেজ শাসন, মোটা কর নিয়ে।

১৯১৪ সালে লুগার্ড উত্তর আর দক্ষিণ একত্র করে আধুনিক নাইজিরিয়ার পত্তন শুরু করলেন। নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন হল।

উত্তরে গড়ে উঠল ছোট ছোট জমিদার। দেশী নৃপতি সর্দার, এমির। অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এরা। এদের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকার দেশ শাসন করে চলল। সামন্ততন্ত্রের ভিত সুদৃঢ় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারীদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করে দেওয়ায় অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে রইল উত্তর নাইজিরিয়া।

দক্ষিণ নাইজিরিয়ার ইংরেজি শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। কয়লা-

খনি, তেলের খনিতে ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে ইবোরা মালিকানার ছিটে-ফোঁটা পেয়ে কায়েম করল ধনতন্ত্র। নতুন নতুন পুঁজিপতিরা নাইজিরিয়ার বাজার জমজমাট করে উত্তরে বিশাল ভূখণ্ড আর বিরাট জনসংখ্যাকে অবাধে শোষণ করার জন্য হাত বাড়াল। সেখানে সাধারণ শ্রমিক হৌসা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইবো।

নতুন নতুন সহর গড়ে উঠল। ইবোরা বাস করে শহরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে, তার নাম সাবন ঘেরিস্।

তারপর ইতিহাসের রথচক্রে নিষ্পেষিত হতে থাকে নাইজিরিয়ার অসংখ্য দরিদ্র নিগ্রো, নানা উপজাতীয়। ব্রিটিশের শোষণ যখন চরম হয়ে উঠল সেই সময় ধ্বক করে জ্বলে উঠল, মাথা নীচু করা অবাধ শোষণের শিকার কালো কালো মানুষেরা। একটি মাত্র আওয়াজ— কর দেব না। ইংরেজ—নাইজিরিয়া ছাড়। বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়ে উঠল দিক হতে দিগন্তে!

সে ধ্বনি নিস্তব্ধ হল ইংরেজের বন্দুকে। তারা বলল 'আবার হাঙ্গামা।' চাপা গুঞ্জন আকাশে বাতাসে ক্রমশঃ মুখরিত হয়ে উঠল। চতুর ইংরেজ সেদিন বুঝতে পারল, অবাধে শোষণ করতে হলে আরো কিছু ছাড়তে হবে। গভর্ণর স্যর আর্থার রিচার্ডস নতুন সংবিধানের সৃষ্টি করে নাইজিরিয়াকে উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব তিনটি অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত করে কিছুটা ক্ষমতা নাইজিরিয়ানদের হাতে ছেড়ে দিলেন। তবু শান্ত করতে পারলেন না তাদের। নতুন এক রাজনৈতিক দল গঠিত হল নামদি আজিকিয়ের নেতৃত্বে। তিনি চাইলেন ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থেকে নাইজিরিয়ার স্বাধীনতা। তাঁর নেতৃত্বে উত্তাল হয়ে উঠল দেশ। সারা দেশময় এক বিরাট সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হল, একটানা ছয় সপ্তাহ ধরে। লণ্ডনে দরবার করেও কোন ফল হল না। তিনটি অঞ্চল নিয়ে নাইজিরিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হল ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে।

পরবর্তী কালে গভর্ণর ম্যাকফারসন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা

বাতিল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের যে আন্দোলন একবার সুরু হয়েছে, তার কি আর শেষ হয়! কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারে উত্তরের লোকেরা অর্ধেক ভাগ চাইল। দীর্ঘ দিন ধরে চলল নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি। আবার দেখা দিল আন্দোলন। আবার নতুন সংবিধান সৃষ্টি করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হল। পূর্বরাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হলেন এন, সি, এন, সি পার্টির নেতা নামদি আজিকিয়ে পশ্চিমে এ্যাকশন গ্রুপের আওলোও, উত্তরে এন, পি, সি পার্টির নেতা স্যর আহমেদু বেল্লো।

তবু রক্ষা করা গেল না সাম্রাজ্য। স্বায়ত্তশাসনের বেড়া ডিঙিয়ে ১৯৬০ সালে স্বাধীন হল নাইজিরিয়া।

কেন্দ্রে এন, সি, এন, সি এবং এন, পি, সি পার্টির মিলিত মন্ত্রী সভা গঠিত হল। প্রধান মন্ত্রী হৌসা উপজাতীয় স্যর আবুবকর তাফাওয়া বালেওয়া। গভর্ণর জেনারেল হলেন ইবো উপজাতীয় নামদি আজিকিয়ে। পূর্বরাজ্যে তখন মুখ্যমন্ত্রী ওকপারা। বিরোধীদলের নেতা হলেন আওলোও পশ্চিম রাজ্যের ভার বিশ্বস্ত অনুচর আকিনতোলার ওপর ন্যস্ত করে।

॥ তিন ॥

বেয়ারা এসে কার্ড দিতেই স্যর ডেভিড এডেকুনলে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন পাঠিয়ে দাও।

বেয়ারা চলে গেল। একটু বাদেই সুইংডোর ঠেলে ঢুকল একজন।

—গুড মর্নিং, আজকাল আর আপনার দেখাই পাই না।

—বড্ড ব্যস্ত আছি, প্রতিটি জেলায় পার্টির মধ্যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

—কি রকম ? ডেভিড বিস্মিত হয়ে তার দিকে চাইলেন।

—সকলেই চায় পারমিট, আচ্ছা বলুন তো, এত পারমিট কোথায় পাওয়া যায়, তা ছাড়া কোয়ালিশন, গভর্ণমেণ্ট, এন, পি, সি পার্টির লোকদেরও তো সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

—নিশ্চয়ই। ইংরেজরা যখন এদেশ ছেড়ে গেল, তখন তো আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম, কে শাসন করবে দেশ।

—ভেবেছিলেন আমরা বুঝি কিছুই পারব না।

—না, না, তা ঠিক নয়, লজ্জিত হয়ে বলেন স্যর এডেকুনলে, তবে কি জানেন, দেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত। এদেরচালানো বড্ড কষ্ট, সেদিন আমি প্রধান মন্ত্রীকে বলেছি···

—থাক এসব প্রশস্তি করে আর লাভ নেই। দেশের কাজে যখন নেমেছি, তখন থেকেই জানি সারাজীবন সংগ্রাম করেই যেতে হবে, সুখ আর কপালে নেই।

—আপনারা হলেন মহান ব্যক্তি। এতবড় এন, সি, এন, সি পার্টির প্রাণ। দেশ আপনাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে।

বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে পার্টির নেতা বললেন—বুঝুন তবে। অথচ ছোঁড়াগুলো দিনরাত চিৎকার

করছে আমরা নাকি ব্রিটিশের পোঁ ধরে আছি। আরে বাবা, ব্রিটিশকে তাড়াল কে এদেশ থেকে।

—ছাড়ুন ওদের কথা।···

বেয়ারা এসে আর একটা কার্ড দিল। স্যর এডেকুনলে কার্ডে চোখ বুলিয়েই বললেন—এখন হবে না পরে আসতে বল।

—আপনি বোধ হয় একটা খবর জানেন না।

—কী বলুন তো। উৎসুক হয়ে তিনি বলেন।

—কেন্দ্রীয় সরকার আইন করছে সমস্ত বিদেশী কোম্পানীতে নাইজিরিয়ান প্রতিনিধি নিতে হবে।

—রিয়েলি ইট ইস্ এ স্পেলনডিড জব। আমাদের দেশে ব্যবসা করবে আর আমাদের প্রতিনিধি নেবে না। এই সব পেট্রোল, রবার, চিনি কোম্পানীগুলো এখন কী করবে।

—শুনছি, পেট্রোল কোম্পানীতে আপনাকে ডাইরেক্টর হিসাবে নেবে।

—তাই নাকি! আমার অবশ্য আপত্তি নেই তাতে।

—আর একটা কথা, প্রধান মন্ত্রী জনসভা করছেন। অন্তত কয়েক লক্ষ লোকের জমায়েত হবে। সহরের বাইরে থেকেও হাজার হাজার লোক আসবে।

এর পরেই কী ধরণের কথা হবে পরিষ্কার বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকেন তিনি।

—এতবড় আয়োজন, খরচের কথা ভেবে পেছিয়ে যাচ্ছি।

—সে কি? খরচের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে আমরা বঞ্চিত হব। কত টাকাই বা আর খরচা হবে। নিশ্চয়ই জনসাধারণ এ টাকা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবে না।

···ক্রিং ক্রিং করে বেলের আওয়াজ হতেই বেয়ারা ছুটে আসে।

—পি, এ।

—পি, এ এসে দাঁড়ায়। অল্প বয়স, সুদর্শন চেহারা। সুমিষ্ট স্বরে বলে—বলুন স্যর।

—হাজার কুড়ি টাকার ব্যবস্থা এখুনি করুন। ক্যাশ।

—আচ্ছা স্যর।

—পি, এ সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে গেল। নিরিবিলি কামরায় আবার দুজনের আলোচনা চলতে থাকে।

—কণ্ট্রাক্টটা পাওয়ার কতদূর কী হল ?

—একটু মুস্কিলে পড়েছি বুঝলেন, এন, এন, সি পার্টি আবার অন্য একজনকে ব্যাক করছে।

—এন. এন. সি পার্টিকে আমি ম্যানেজ করব। এ কণ্ট্রাক্ট যেন অন্য কেউ না পায়। মিনিস্টারকে আমি আজই ফোন করে দেব। আর তা ছাড়া মিনিস্টারের ছেলে তো কাল থেকে আমার ফার্মে জয়েন করছে।

—তাই নাকি, তা তো জানতাম না।

—আর দেখুন, আপনার পার্টি খনি অঞ্চলে লেবার ট্রাবল করার চেষ্টা করছে।

—ও একটু আধটু হবেই, তার জন্য চিন্তা করবেন না, আমরা আছি। কিছু না করলে য়ুনিয়নগুলো বামপন্থীদের হাতে চলে যাবে।

—তাই বলছিলাম, আপনি থাকতে আর ভয় কি !

পি, এ, হাতে করে নোটের বাণ্ডিল নিয়ে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল। বাণ্ডিলগুলো পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে নেতা বললেন—আজ চলি।

সুইং ডোর ঠেলে নেতা বেরিয়ে গেলেন। স্যর এডকুনলের অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা ব্যাঙ্কে। কিছুদিন ধরে স্ত্রীর নামে একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী খোলা হয়েছে, সেই কোম্পানীর নামে দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে বাকি টাকাটা নিয়ে গেলেন পার্টি অফিসে।

স্যর এডকুনলে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। মনের মধ্যে অসংখ্য চিন্তা। একটা না একটা লেগেই আছে। আবার এন. এন. সি পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। দেশকে এখন শক্ত হাতে গড়ে তোলা চাই। আরো ইণ্ডাস্ট্রি বাড়াতে হবে। শিল্প ছাড়া কি কোন দেশ বড় হয়?

—ক্রিং···ক্রিং। ফোন বেজে উঠলো।

—হ্যালো কে? আরে···লেডী···তুমি, সত্যি তুমি যে ফোন করবে ভাবতেই পারিনি, নিশ্চয়ই সন্ধ্যেবেলায় হোটেলে যাব···কি বললে গভর্ণরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বেশ বেশ। দেখ, যদি কিছু করতে পার। তোমার নামে সুইস ব্যাঙ্কে একটা এ্যাকাউন্ট খুলেছি··· প্লীজ রাগ করো না, তুমি রাগলে বড্ড ব্যথা পাই। আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি।

ফোনটা ছেড়ে স্যর এডকুনলে চেয়ারে গা এলিয়ে দেন। আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না, মনটা কেমন উদাস হয়ে ওঠে। মনে হয় এইসব অফিস টফিস ছেড়ে এখুনি কোথাও চলে যাই। মৃদু মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে, নরম এক গুচ্ছ চুল বারবার তার মুখের ওপরে উড়ে আসে, কি রকম একটা অনুভূতি তাঁকে চঞ্চল করে তোলে।

—কে? চমকে উঠে স্যর এডেকুনলে আবার ফিরে আসেন অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে।

—ট্রাঙ্ককল এসেছে, মজুরগুলো ভীষণ গণ্ডগোল শুরু করেছে। কয়লার প্রডাকশন খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

—কাদের য়ুনিয়ন?

—বামপন্থীদের।

আই. জি-কে ফোন করে দাও, গুলি চালিয়ে ঠাণ্ডা করুক।

—আচ্ছা স্যর।

—আর শোন, কয়লা আর তুলোর দাম বাড়িয়ে দাও। সমস্ত এজেন্টদের নোটিশ দিয়ে দাও সামনের মাস থেকে দাম বাড়বে।

—গভর্ণমেণ্টের পারমিশান নিতে হবে না, স্যর ?

—সে আমি বুঝব, যা বলি তাই কর।

—ইয়েস্ স্যর।

—সেক্রেটারিয়েটে গিয়েছিলে ?

—না স্যর।

—একটাও কাজ তোমাদের দিয়ে হয় না, কি কর সারাদিন। আজই যাবে। সেক্রেটারীকে নিয়ে গিয়ে তুলবে হোটেল নাইজারে।

—আচ্ছা স্যর।

—আর শোন এ্যাকসনগ্রুপের সঙ্গে একটু আধটু যোগাযোগ রেখ। হাজার হলেও ওরা বিরোধীদল। বলা যায় না পার্লামেণ্টে কখন কোন প্রশ্ন তোলে।

—একটা কথা বলব স্যর।

—তাড়াতাড়ি বল, বেশী সময় নেই, আমি বের হব।

—আমার ভাইয়ের চাকরিটা হল না। তাই বলছিলাম স্যর···

—ওটা হবে না। ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারের শালাকে ওটা দিতে হবে। এক কাজ কর, ওকে পশ্চিম জেলার পেট্রোল ডিস্ট্রিবিউটার হয়ে যেতে বল, পয়সা আছে। আর আমি এখন ডাইরেক্টর হয়ে যাচ্ছি, কোন অসুবিধে হবে না।

—আচ্ছা স্যর।

পি, এ, সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে এসেই ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলল। সোজা সেক্রেটারিয়েটে এসে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে তাকে নিয়ে চলল হোটেল নাইজারে।

গেটের মুখে তকমা আঁটা দারোয়ান সেলাম করে পথ দেখিয়ে দেয়। পি, এ, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সেক্রেটারীকে নিয়ে সোজা বারে এসে কোণের দিকে টেবিল দেখে বসল।

—অর্ডারটা এখনো বের করলেন না স্যর।

—আরে মোটেই সময় পাচ্ছি না, টেবিলে একগাদা ফাইল জমে

গিয়েছে। এমন কাজের চাপ পড়েছে, তার মধ্যে দেশের লোকগুলো হয়েছে যেন এক একজন লাটসাহেব। কথায় কথায় মিনিস্টারের কাছে দরখাস্ত, এটা চাই, ওটা চাই কত বায়নাক্কা।

—বাঃ স্বরাজ পেয়েছে না। পি, এ হেসে হেসে বলে।

স্বরাজ না হাতি, রোজই ঘুষ খাওয়ার কমপ্লেন শুনতে হচ্ছে। আর নীচের দিকে বড্ড ঘুষ বেড়ে গেছে, টাকা ছাড়া কেউ কোনও কাজই করতে চায় না। আমার ভাইপোকে সেদিন চাকরিতে ঢুকিয়েছি এর মধ্যেই সে উপরি রোজগার করছে।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে তার। অর্কেস্ট্রার মৃদু সুর মনের মধ্যে চঞ্চলতা জাগিয়ে তোলে। পি, এ, পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য ডায়েরি বের করে টেবিলে রাখে। সেক্রেটারী ডায়েরিটা দেখে বলে—বাঃ সুন্দর তো।

—আপনার পছন্দ হয়েছে স্যর।

সেক্রেটারী ডায়েরিটা তুলে নেয়। ভেতরটা খুলেই বন্ধ করে ফেলে। কারেন্সি নোটে ভর্তি। পকেটে রেখে দিতে দিতে বলে —চলি।

—এখুনি উঠবেন।

—হ্যাঁ। স্যর এডেকুনলেকে বলবেন কোন চিন্তা নেই।

—চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

—আমি আবার একটু ক্লাবে যাব।

—বেশ তো।

গাড়ী ছুটে চলেছে। সমুদ্রের হাওয়া লাগোসের পথের ওপর দিয়ে হুঁ হুঁ করে বয়ে যায়। ডাইনে বাঁয়ে বার কয়েক ঘুরে গাড়ীটা এসে থামল ক্লাবের দোর গোড়ায়। সেক্রেটারী গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াতেই লেডী এডেকুনলের সঙ্গে দেখা।

—এত দেরী করলে যে।

—আর বলো না, আচ্ছা এক কর্মচারী রেখেছ, দিনরাত জ্বালিয়ে খায়। চল এখন।

আজকের মত পি, এ-র চাকরি শেষ। গাড়ীটা মালিকের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, কোন চিঠি আছে কিনা দেখেই ছুটি পেয়ে যাবে।

গ্যারেজে তখনো গাড়ীটা ঢোকেনি, গোঁ গোঁ শব্দ করছে। চিঠিটার জবাব লিখে খামের মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সেক্রেটারী। বের হবার জন্য পা বাড়াতেই দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিস এডেকুনলে। দীর্ঘ পাতলা কিশোরী। পি. এ, থমকে দাঁড়াল।

—কাজ হয়ে গেল বুঝি।

—হ্যাঁ কিছু বলবেন।

—সেদিন তো খুব ফাঁকি দিলেন, আসবেন বলে আর এলেন না।

—একদম সময় পাইনি, বড্ড কাজ পড়ে গিয়েছিল।

—কাজ না ছাই। আমাকে দেখলেই আপনি কেবল পালিয়ে যেতে চান। চলুন না এখন একটু বেড়িয়ে আসি।

—এখন ?

—হ্যাঁ। বড্ড গরম পড়েছে, সমুদ্রের ধারে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। আসুন।

পি, এ-র হাত ধরে টান দিতেই সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে শিরশির করে উত্তেজনার শিহরণ বয়ে যায়। মিস্ এডেকুনলের দিকে চেয়ে দেখে। কোঁকড়ানো কালো চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। কোমল মুখের দীপ্ত চোখ দুটোতে কিসের যেন আহ্বান।

চোখ দুটো বড় বড় করে সে মেয়েটির দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে নিজের হাতটা তার ঘাড়ের উপরে রাখল। অনাবৃত ঘাড়ে হাত রাখতেই হাতের মধ্য দিয়ে মাথায় বয়ে যায় তড়িৎগতি। আরো ঘন হয়ে তার বুকের কাছে নিজের মাথাটা নিয়ে এসে মিস এডেকুনলে তার দিকে তাকায়। সমস্ত শরীরে আগুন ধরে যায় পি, এ-র। ঘাড় থেকে হাতটা আরো

নীচে নেমে মুঠো হয়ে বন্ধ হতেই চেটোর মধ্যে এক অনন্ত কামনা তাকে উত্থিত করে তোলে। তারপর ধীরে ধীরে বলে—চল।

আজ একটু সকাল সকাল বের হতে হবে। মন্দ লাগছে না এই সাংবাদিক জীবন। কলেজ থেকে বের হবার পরে অনেক চেষ্টা করেও চাকরি যোগাড় করতে পারল না আকুয়া। অজস্র দরখাস্ত আর অসংখ্য ইন্টারভ্যু দিয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। আগে থেকেই লোকজন ঠিক হয়ে থাকে। অথচ তার এমন মুরুব্বির জোর নেই যে সামান্য একটা কেরাণীর চাকরি জোগাড় করে। তার চেয়ে এই ভাল। অনেক রোমাঞ্চকর সংবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, সমাজের বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, আর এক একজন মহারথীদের ব্যক্তিগত জীবন দেখে নিথর হয়ে যেতে হয়।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সে উঠে দরজা খোলে। ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর।

—কি রে গ্রেপ্তার করবি নাকি?

—না। করলেও হয়তো ফোন আসবে অমুককে ছেড়ে দিতে হবে।

—এ রকম বুঝি প্রায়ই আসে।

—সেই বিপদের কথাই তোকে বলতে এসেছি। চাকরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তার পরে কাল যা ঘটেছে তাতে বেশ অসুবিধেয় পড়ে গেছি।

—কী রকম। আকুয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

—দিন কতক আগে একজনকে অ্যারেষ্ট করেছিলাম।

—তার অপরাধ।

—অনেক। নাম করা গুণ্ডা। ওপর থেকে হুকুম এল তাকে ছেড়ে দিতে হবে। বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিলাম।

—কেন? অভিযোগের প্রমাণ নেই।

—ছাড়তে হবে। রাজনীতির খেলা। ছেড়ে তো দিলাম। সে যথারীতি বুক ফুলিয়ে চলে গেল। পেছনে মুরুব্বি রয়েছে, ভয়টা কিসের। জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুই করার নেই তাদের। কাল সুযোগ পেয়ে আমাকে ধরেছে ষাট সত্তরজন। তাদের সামলানো দায়। এখুনি গ্রেপ্তার করতে হবে গুণ্ডাটাকে। কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে আমার ক্ষমতা সামান্য, কিছুই করতে পারব না। কিন্তু কে কার কথা শোনে, মারমুখী হয়ে উঠল সবাই।

—এতেই ঘাবড়ে গেছিস। এখন কি করতে হবে বল।

—কাগজে লেখ গুণ্ডামি খুব বেড়েছে, এতে যদি কর্তাদের টনক নড়ে।

—নড়বে কি না সন্দেহ, দেশের অবস্থা খুব জটিল। চড় চড় করে জিনিসের দাম বাড়ছে। সর্বত্র হাহাকার! কিছু করতে পারিস না তোরা।

—শোন তবে, গত সপ্তাহে একজনকে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। ডাকাতের মত কালোবাজারী করছে, এতটুকু গোপনীয়তা নেই। ওপরে জানালাম তাকে এ্যারেষ্ট করব। ধমক খেলাম। সহকর্মীরা বলল চাকরি করতে এসেছ, চাকরি কর। সব ব্যাপারে তোমার নাক গলানোর কি দরকার। যাকগে, তুই একটু চেষ্টা করিস। এখন চলি।

ইন্‌সপেক্টর চলে গেল। পুলিশের কাজ সত্যি ঝকমারির। কত রকম বিপদ যে মাথায় নিয়ে কাজ করতে হয় তার ঠিক ঠিকানা নেই। অবশ্য সাংবাদিকদেরও অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সেদিনের কথা মনে হলে আজো গা শিউরে ওঠে আকুয়ার।

পার্লামেন্টের সেসন বসেছে। বিরোধী নেতা আওলোও তীব্র ভাবে আক্রমণ করল সরকার পক্ষকে। এ্যাংলো নাইজিরিয়ান এগ্রিমেন্ট হতে চলেছে। প্রধান মন্ত্রী আবেগ ভরে জানালেন এই

চুক্তির ফলে নাইজিরিয়ার কি সুবিধা হবে। ব্রিটেনের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার ফলে নাইজিরিয়ার দেশরক্ষা আরো সুদৃঢ় হবে। বহিঃশত্রু চট করে আক্রমণ করার কথা ভাববে না।

—কোন দেশ কি নাইজিরিয়া আক্রমণের কথা ভাবছে। একজন বিরোধী সদস্য জিজ্ঞেস করে।

—কোন দেশ কী ভাবছে কেমন করে জানা যাবে। আমাদের উচিত দেশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর।

—এতে আমাদের সুবিধা কোথায়, ব্রিটেন অস্ত্র বিক্রি করে টাকা লুটছে। ব্রিটেনের সুবিধের জন্যই এই এগ্রিমেণ্ট।

—আমরা আমাদের কথা চিন্তা করছি। ব্রিটেনের কথা চিন্তা করি না।

—এতে মার্কিন সরকার অসন্তুষ্ট হতে পারে। এমনিতে তারা যথেষ্ঠ সুযোগ পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছে।

—এ কথা সত্যি নয়। স্বাধীনতা পাওয়ার এক বছরেই আমেরিকার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বেড়েছে।

—এ চুক্তি বাতিল করুন। যান, বাইরে যান। দেশের জনসাধারণ সেখানে অপেক্ষা করছে, তাদের মতামত জানুন।

—দরকার হয় আপনারা বেরিয়ে যান।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল হৈ চৈ। টেবিল চাপড়িয়ে সরকারী আর বিরোধী পক্ষ এমন গণ্ডগোল আরম্ভ করে দিল যে কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব। স্পীকার বার বার হাতুড়ি ঠুকতে শুরু করেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে।

বাইরেও তখন প্রচণ্ড গণ্ডগোল সুরু হয়েছে। আকুন্না পার্লামেণ্ট থেকে বের হয়ে এল। রাস্তায় এসে দেখে হাজার হাজার লোক এসে জমায়েৎ হয়েছে, তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে সব।

—ইঙ্গ নাইজিরিয়া চুক্তি—বাতিল কর, বাতিল কর।

—ইংরেজের তাঁবেদারি—ছাড়তে হবে, ছাড়তে হবে।

পোস্টার আর ব্যানারে সমস্ত আকাশ ঢাকা পড়েছে। আন্দোলনকারী মানুষগুলো থমকে দাঁড়িয়ে আছে, পুলিশ কর্ডন করে ঘিরে রেখেছে। মানুষগুলো ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠছে, তাদের চঞ্চলতা আর রোধ করা যায় না। হঠাৎ একটা ছেলে য়ুনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে দিল। হৈ হৈ করে উঠল সবাই। পাঁচ ছজন জোর করে ফ্ল্যাগটা নামিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন দেয়াশালাই জ্বেলে দিল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতেই উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠল জনতা।

—চার্জ। মার মার করতে করতে পুলিশ ব্যাটন চালায়। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড়তে সুরু করে।

ফট্ ফট্ ফট্। কাঁদানে গ্যাস ছাড়তে থাকে পুলিশ। শেলগুলো ফেটে ফেটে ধোঁয়ায় অন্ধকার সারা জায়গাটা। চোখ মুছতে মুছতে আকুয়া এগোতে থাকে। ডান দিকের গলিটায় ঢুকেই বুঝতে পারল খুব ভুল করেছে। অসংখ্য মানুষ এই ছোট্ট গলিটায়। আবার পুলিশ তাড়া করছে। আকুয়া ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল তখন সে হাসপাতালে।

আরো কিছুদিন ধরে আন্দোলন চলল। বিভিন্ন শহরে ইংরেজ-বিরোধী বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। শেষ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যর ডেভিড হাণ্ট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

অনেক দেরী হয়ে গেছে। আকুয়া তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

টেলিপ্রিণ্টারের খুট খুট আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল। এডিটরের স্টেনো আর ম্যাগাজিন সেকশনের এডিটর অন্ধকারের মধ্যে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু একটা কথা কানে ভেসে এল—কেউ দেখে ফেলবে।

—দেখুক গে।

আকুয়া উপরে উঠে গিয়েই দেখে জমজমাট আসর। আকুয়া যেতেই হৈ হৈ করে সকলে অভ্যার্থনা জানাল।

—আরে ভাই একজিবিশন ম্যাচ দেখতে যাবে নাকি। হরেক মজা।

—কি ফুটবল? কোন টিম আসছে?

—ফুটবলও নয়, বা ইংরেজদের ক্রিকেট নয় যে পাঁচদিন খেলার পরও অমীমাংসিত। দাদা টেনে টেনে কথা বলে।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

—এ হচ্ছে গ্রেট ওয়েষ্ট আফ্রিকান গেম, একেবারে নকআউট টুর্ণামেন্ট। ড্র হবার কোন সম্ভাবনা নেই, একজনকে যেতেই হবে।

—কে যাবে দাদা।

—যার গায়ে শক্তি কম। এ তো সোজা কথা।

—সে তো বটেই, তবে শক্তি কার বেশী।

—সেইটেই তো কথা, সব কিছু এখুনি ফাঁস করে দেব। এসব টপ সিক্রেট নিউজ, অন্য কাগজে গেলে লুফে নেবে। তবে আকিন-তোলার জয় জয়াকার।

—অসম্ভব। বিরাট গর্জন করে বলে একজন।—পার্টিতে আওলোও অনড়, অটল তাকে সরায় কে।

—হুঁ হুঁ, দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভেন এণ্ড আর্থ, কেন্দ্রীয় সরকারে কার প্রতিপত্তি, ইংরেজ মার্কিন কাকে ব্যাক করবে, স্যর এডেনকুনলে তোফাজ্জল কোন দিকে ঝুকবে—এসব অনেক ব্যাপার রে ভাই, রাজনীতি বড় কঠিন বৎস, বুঝবার চেষ্টা করো না।

—স্যর এডেকুনলের ব্যাপারটা এখুনি জেনে নিচ্ছি, ওর মেয়ের সঙ্গে আবার আকুয়ার একটু ইয়ে আছে।

—তাই নাকি, ডুবে ডুবে জল খাওয়া। বামন হয়ে চাঁদে হাত।

—আপনারা কানে হাত না দিয়েই চিলের পেছনে ছুটছেন।

—আরে ভাই তোমাকে বিবৃতি দিয়ে নিজের অবস্থা জানাতে হবে না। কাজের মধ্য দিয়েই জনসাধারণ ঠিক চিনে নেবে।

—থাকগে এসব কথা, লড়াই তবে শুরু হচ্ছে।

—নিশ্চয়ই। আওলোও বনাম আকিনতোলা।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আওলোও বুঝতে পারলেন তিনি ভুল করেছেন। যদিও এ্যাকসন গ্রুপ পার্টির নেতৃত্ব তাঁর হাতে তবু স্বাধীনতার পর ভেবেছিলেন রাজ্যের রাজনীতিতে না থেকে কেন্দ্রে গেলে সুবিধে হবে। পশ্চিম নাইজিরিয়ার মুখ্যমন্ত্রীত্ব আকিনতোলার হাতে দিয়ে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা হবেন। কিছুদিন বাদেই বুঝলেন মস্ত ভুল হয়েছে। সর্ববিষয়ে আকিনতোলা তাঁর চেয়ে এগিয়ে গেছেন। পশ্চিম রাজ্যে সে তার প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়ে পার্টিতে বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

সৃষ্টি হল দুই নেতার কলহ। পার্টির মধ্যে ফাটল অনিবার্য হয়ে উঠল। নেতাদের কলহ নিম্নগামী, ক্যাডাররা এর হাত থেকে রেহাই পেল না। ঘটনা চরম হয়ে দেখা দিল পার্টির কনভেনশনে।

বেশ বড় প্যাণ্ডেল। প্রচুর ডেলিগেট এসেছে। ডায়াসের ওপর বসে রয়েছে আওলোও, আকিনতোলা, এনাহোরো এবং আরো অনেক নেতা। একটার পর একটা প্রস্তাব আসছে। চিৎকার, হৈ চৈ, গণ্ডগোল, ঝগড়া-ঝাটির মধ্য দিয়ে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

এবার একজন প্রস্তাব নিয়ে এল একেবারে নতুন রকমের। আকিনতোলার সমর্থকরা ভাবতেও পারে নি এধরণের প্রস্তাব আসতে পারে। কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ করে রইল।

—এ প্রস্তাব অবৈধ, আমরা মানিনা।

—চুপ করুন, শুনতে দিন।

—মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা। আবার শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড

গণ্ডগোল। স্লোগান শুরু হল—আকিনতোলা··· —জিন্দাবাদ। —বিভেদপন্থীরা ধ্বংস হোক।

আওলোও সমর্থকরা নীরবে সহ্য করল না। তারাও পাল্টা স্লোগান দিতে থাকে—আকিনতোলা—মুর্দাবাদ।

—ঘুষখোর। —গদি ছাড়—বিভেদপন্থী—ধ্বংস হোক .

প্রায় হাতাহাতি লেগে যায় দেখে সভাপতি পনের মিনিটের জন্য সভা বন্ধ করে দিলেন। হৈ হৈ করতে করতে ডেলিগেটরা বেরিয়ে এল। সবাই গিয়ে দখল করল রেঁস্তরায় চেয়ারগুলো। আর শুরু হয়ে গেল জল্পনা কল্পনা, কে কাকে ভোট দেবে। আকিনতোলার বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপন হবে এ বিষয়ে সবাই নিশ্চিত। টেবিলে টেবিলে উত্তেজিত ডেলিগেটরা তর্ক জুড়ে দিয়েছে।

—সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, এ সরকারের আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে পদত্যাগ করা উচিত।

—ব্যর্থতার কি দেখলেন ? শাসন ব্যবস্থা বেশ ভালই চলছে।

—একে শাসন ব্যবস্থা বলে। দেশে কোন সরকার আছে ? প্রকাশ্যে সবাই ঘুষ খাচ্ছে, এমন কি ঘুষ না দিলে আদালতে কোন কাজ হয় না। দিনের পর দিন জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। সামনে ইলেকশন্, জনসাধারণের কাছে গিয়ে আবার ভোট চাইতে হবে না ?

—আগেও এ রকম ছিল। তখন ইংরেজ রাজত্ব ছিল, আর এখন আমরা স্বাধীন। আমাদের দায়িত্ব অনেক। এই সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কী করেছে। শুধু নিজেদের পকেট ভরা ছাড়া।

—সাবধানে কথা বলবেন। আপনি ভদ্র ভাষায় কথা বলবেন।

দুজনেই মারমুখী হয়ে ওঠে। একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যায় দেখে কয়েকজন এসে মধ্যস্থতা করে থামিয়ে দেয়।

আবার সভা বসে। গুরু গম্ভীর আবহাওয়া। দুটো দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে ডেলিগেটরা। গম্ভীর কণ্ঠে তারা প্রস্তাব পাঠ করল।

যেহেতু আকিনতোলা প্রশাসনে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন সেই হেতু এ্যাকশন গ্রুপের সুনাম রক্ষার্থে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হোক। যথারীতি প্রস্তাব সমর্থিত হল। বারকয়েক হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। এত হৈ চৈ করেও বন্ধ করা গেল না, প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। এমন কি দলের পার্লামেণ্টারি পার্টিও ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করল।

কনভেনশন শেষ হতেই আওলোও পার্টির প্রস্তাব নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন।

—আপনার কি মনে হয় বিধানসভায় আকিনতোলা মাইনরিটি।

—নিশ্চয়ই পার্টিতে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে। কেউ এর বিরোধিতা করার সাহস করবে না।

—কিন্তু আকিনতোলার একটা গ্রুপ রয়েছে। তারা কতজন না জেনে চট করে সরকার ভেঙ্গে দেওয়া কি ঠিক হবে।

—তাঁর দলেও কিছু আছে তবে তা অতি সামান্য। আপনি কোনরকম শঙ্কা না করেই এ কাজ করতে পারেন।

—আরো বিবেচনা করতে হবে, কেন্দ্র এ ব্যাপারে রিপোর্ট চাইতে পারে।

—সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন কেন্দ্রের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব। মোটের ওপর এ সরকার আর এক মুহূর্তও চলতে দেওয়া যেতে পারে না।

—বেশ, দেখি কতদূর কি হয়। রাজ্যপাল আকিনতোলাকে পদচ্যুত করে, আওলোওর সমর্থক এডেগবেনরোকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন।

আকিনতোলা প্রধান মন্ত্রীর কাছে আবেদন করে শাসালেন বিধানসভায় দেখিয়ে দেবেন কি করে পেছনের দরজা দিয়ে আসা-মন্ত্রী সরকার চালায়।

দিন কয়েক বাদেই বিধান সভার অধিবেশন বসল। জমজমাট

অধিবেশন। গ্যালারীতে তিল ধারণের স্থান নেই। দর্শকে পরিপূর্ণ। একে একে এম, এল, এ-রা আসতে আরম্ভ করেছে। চরম উত্তেজনা বিধান সভার বাইরে, হাজার হাজার উত্তেজিত জনতা। পুলিশ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে জনতাকে সামালাতে।

আকিনতোলা এসে প্রবেশ করলেন। প্রচণ্ড হর্ষধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হল। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে গিয়ে তিনি বসলেন। চাপা উত্তেজনা আর টিপ্পনি গরম করে রেখেছে সদস্যদের।

মুখ্যমন্ত্রী এসে প্রবেশ করলেন। তৎক্ষণাৎ বিরোধীরা প্রচণ্ডভাবে গণ্ডগোল সুরু করে দিল।

—বিশ্বাসঘাতককে চিনে নিন—এই মাটিতে কবর দিন—এডেগবেনরোর জায়গা কোথায়—খিড়কির দরজা আবার কোথায়

স্পীকার এসে অনুরোধ করলেন, কিন্তু কিছুতেই গোলমাল থামছে না। বারবার চেষ্টা করেও সভার কাজ আরম্ভ করতে ব্যর্থ হলেন তিনি। অনির্দিষ্ট কালের জন্য সভা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

ধাঁই করে একটা দোয়াত এসে পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমর্থকরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল নিরাপত্তার জন্য। একজন সদস্য আর্তনাদ করে বসে পড়েছে, ভাঙা চেয়ারের পা এসে আঘাত করেছে তার মাথায়।

দু'পক্ষই অত্যন্ত উত্তেজিত। হাতের কাছে যে যা পাচ্ছে তাই ব্যবহার করছে। জনকয়েক ইতিমধ্যে আহত হয়েছে। পুলিশ এসে গেছে। প্রথমে তারা সদস্যদের অনুরোধ করল বিধানসভা ছেড়ে যেতে। শেষ পর্যন্ত মারমুখী সদস্যদের বের করে দেবার জন্য টিয়ারগ্যাস ছুঁড়তে বাধ্য হয়।

রাজ্যের অবস্থা চরমে উঠতেই প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করে একজন প্রশাসক নিযুক্ত হল।

আকিনতোলা অত্যন্ত তৎপর হয়ে লাগোসে এলেন। এসেই

দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। আওলোওর বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ।

আকিনতোলা চিন্তিত মুখে লাগোসের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে থাকেন, একটা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

সংবাদপত্রে আওলোওর দুর্নীতির খবর প্রকাশ হয়ে পড়ল। রীতিমত চাঞ্চল্যকর সংবাদ। বিদেশী ফার্মগুলোর কাছ থেকে পার্টি ফাণ্ডে টাকা নেওয়া হয়েছে, আর সে টাকার অধিকাংশ নিজের তহবিল স্ফীত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী এই সুযোগে কমিশন বসালেন। ককার কমিশন দিনের পর দিন অসংখ্য সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হল।

শুধু তাই নয়, আওলোওর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হল। অভিযোগে প্রমাণ হল যে গভর্ণর জেনারেল, প্রধান-মন্ত্রীকে বন্দী করে আওলোও নিজেই নাইজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। আওলোওর দশ বছর জেল হয়ে গেল, তাঁর সহকারী এনাহোরোর পনের বছরের জেল হল।

আকিনতোলা আবার পূর্ণোদ্যমে রাজনীতির চক্রে আবর্তিত হতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার ইউ, পি, পি পার্টি জনমানসে স্থান করে নিল।

পশ্চিম নাইজিরিয়া রাজ্যে একটি অধ্যায় শেষ হল। শুরু হল আর এক অধ্যায়ের।

খুব সন্তর্পনে আকুয়া অগ্রসর হতে শুরু করে। অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, রাস্তার আলোগুলো জ্বলেনি কিংবা জ্বলেছিল, কেউ নিভিয়ে দিয়েছে। একটা থমথমে ভাব চারদিকে। পরশুদিন একটা মারপিট হয়ে গেছে এ অঞ্চলে।

দুম্ দুম্। পর পর দুটো বোমা পড়ল। রাস্তা দিয়ে লোকজন

ছুটতে আরম্ভ করেছে। দোকানের পাল্লাগুলো ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যায়। আকুয়া ছুটে গিয়ে একটা দোকানে ঢোকে। আরো জনকতক এখানে ঢুকেছে। এতগুলো লোকের সমাবেশে বেশ গরম বোধ হতে থাকে। দরজাটার কাছে যেতেই কে একজন পেছন থেকে বলে ওঠে—খুলবেন না, এখনো চলছে। দূর থেকে ভেসে আসছে স্লোগান।

দুম্ দুম্। আবার দুটো বোমা ফাটল। একজনের গগনভেদী আর্তনাদ দোকানের ভেতর থেকেই শোনা গেল। আরো জন কয়েক রাস্তা দিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। দুটো দলে যে মারপিট শুরু হয়েছে বেশ বোঝা যায়। আবার একজনের চিৎকার ভেসে আসে। তারপর শোনা যায় গাড়ীর শব্দ। বোধহয় পুলিশের গাড়ী।

ফট্ ফট্ ফট্। টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটছে। দোকানের মধ্যেও ধোঁয়া এসে প্রবেশ করে। চোখ জ্বালা করছে। একটু জল পেলে সুবিধে হত। কিন্তু এখন জল পাওয়া যাবে কোথায়।

—একটু সরে যান, একটু জায়গা করে দিন মেয়েটি বোধহয় মরল।

—হাওয়া ছাড়ুন, দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—কোথায় যাব মশাই, জায়গা রয়েছে?

—উঃ জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠল, বাবুরা কেউ এম, এল, এ হবেন, কেউ মন্ত্রী হবেন আর মাশুল দিতে হবে আমাদের।

—আপনি মন্ত্রী হোন না দাদা, তবে তো আর মাশুল দিতে হয় না, বরং উল্টে মাশুল পাবেন।

—কাজ নেই আমার অমন মন্ত্রী হয়ে। মন্ত্রীত্বের ঠেলা এই কবছরে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, এর চেয়ে ব্রিটিশরা ঢের ভালো ছিল।

—আপনার এ কথা ঠিক নয়। অন্ততঃ আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি।

—নিশ্চয়ই স্বাধীনভাবে মারপিট করার অধিকার পেয়েছি। দাঙ্গা হাঙ্গামায় অনেক জাতির চেয়ে আমরা দ্রুত এগিয়ে গেছি, না কি? বলেই ভদ্রলোক হাসতে থাকেন।

আকুয়া এগিয়ে এসে অসুস্থ মেয়েটির চোখে মুখে জল দিতেই সে চোখ মেলে চায়। স্যর এডেকুনলের মেয়ে। এখানে এল কী করে, কিছুতেই ভেবে পায় না সে। আজকে নির্বাচনী মিটিং ছিল ইউ, পি, জি—এর। তার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে বলে তো মনে হয় না। অবশ্য কিছুই বিচিত্র নয়। এবারকার নির্বাচনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে।

পাঁচ বছর ধরে দেশ শাসন করছে এন, পি, সি, আর এন, সি, এন, সি পার্টি মিলিত ভাবে। হোসা আর ইবো। এবার নির্বাচনের গোড়াতেই এন, পি, সি পার্টির নেতা স্যর আহমেদু বেল্লে নির্বাচনী আঁতাত ভেঙ্গে দিলেন। আঁতাত গড়ে উঠল আকিনতোলার ইউ, পি, সি পার্টির সঙ্গে। নতুন ফ্রন্ট গঠন হল—নাইজিরিয়ান ন্যাশানাল এলিয়ান্স (এন, এন, এ)। অপর দিকে এন, সি, এন, সি পার্টি উপায়ন্তর না দেখে আওলোও গ্রুপের সঙ্গে সমঝোতা করে সৃষ্টি করল ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ গ্র্যাণ্ড এলিয়ান্স (ইউ, পি, জি, এ)। নির্বাচন উপলক্ষে মারপিট লেগেই থাকল সারা দেশ জুড়ে।

মিস্ এডেকুনলে উঠে বসার চেষ্টার করে।

—উঠবেন না, আর একটু অপেক্ষা করুন।

—বড্ড গরম লাগছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

—দেখছি বের হওয়া যায় কি না।

দরজা খুলতেই এক ঝলক হাওয়া এসে ঘরে ঢুকল। রাস্তায় লোকজন নেই। একটা পিচের ড্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে পুলিশের গাড়ী দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে।

বাইরে আসতেই ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে মিস্ এডেকুনলে অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বলে—গাড়ীটাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। দয়া করে একটু খোঁজ করুন না।

আকুয়া অন্ধকারের মধ্যে গাড়ীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। মিস্ এডেকুনলে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে নিজেকে। দোকানের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তিতে প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছিল।

গাড়ী এসে দাঁড়াল। আকুয়া নেমে এল। ড্রাইভার জানাল যে গণ্ডগোল আরম্ভ হতেই নিরাপত্তার জন্য সে এক গলির মধ্যে গাড়ী নিয়ে যায়।

খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিতেই সে বলে—সে কি আপনি যাবেন না ?

—না। 'এখন অফিসে যেতে হবে, রিপোর্ট লিখতে হবে। আর একদিন দেখা হবে।

—বা রে, আসুন। আমি কত আশা করে আছি।

কথাটা আকুয়ার কানে গিয়ে বাধে। বলে কি মেয়েটা! স্যার এডেকুনলের মেয়ে একজন সাংবাদিককে এই কথা বলছে!

—আজকে মাপ করুন, কাল অবশ্যই দেখা হবে।

—আপনার অভিরুচি। তবে অনেক আশা ছিল। মেয়েটি গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলে।

তার চোখের দিয়ে চেয়ে আকুয়া অবাক হয়ে যায়। বড় বড় চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। আর একটু উত্তাপ পেলেই ফোঁটা ফোঁটা করে গলে গলে পড়বে। কেমন যেন নিজেকে মনে হয়। না গেলে হয়তো অন্যায় করা হবে। একটু ভেবে খুব মৃদুস্বরে বলে —চলুন।

খুশিতে মেয়েটির চোখ দুটো ঝলমল করে ওঠে। দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে আকুয়াকে ধরে পাশে বসায়। আঙুলে আঙুলে স্পর্শ হতেই কেমন যেন বিবশ হয়ে ওঠে মন। আজকাল আকুয়ারও কী যেন হয়েছে, মাঝে মাঝেই মন কেমন করে ওঠে মেয়েটিকে দেখার জন্য।

হুঁ হুঁ করে গাড়ী ছুটে চলেছে। হাওয়ায় মেয়েটির চুল বারবার এসে উড়ে পড়ছে তার মুখের ওপরে। মেয়েদের চুলে একটা

সৌরভ। এলান শিথিল দেহটার দিকে নিষ্পলক হয়ে সে চেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে মেয়েটির একটি হাত এগিয়ে এসে তার হাত ধরে। হাতের উষ্ণতা খুব ভাল লাগে আকুয়ার। এই মুহূর্তে শুধু অনুভূতি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে। ভুলে যায়, সে একজন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, পাশে বসা মেয়েটি কোটিপতির আত্বরে তুলালী।

—আপনার একটা কবিতা শোনাবেন।

চমকে ওঠে আকুয়া। আর একটু জানালার দিকে সরে বসে। মেয়েটি তার এই সরে বসা লক্ষ্য করেছে। মুখে কিছু না বলে তার দিকে চেয়ে থাকে নির্বাক হয়ে।

—এখন না। এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে কবিতা ভাল লাগে না। অন্য সময় বলব।

—নতুন আর কিছু লিখেছেন?

—না। মোটেই সময় পাচ্ছি না। অফিসের কাজেই সব সময় ফুরিয়ে যায়।

—সে কি! আপনি কবি, খবরের কাগজে লেখার জন্য আপনার জন্ম নয়। দেশ আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। আপনার প্রতিভার সৌরভ ছড়িয়ে দিন দেশের প্রতি প্রান্তরে।

এমনি করে তো আর কেউ কথা বলেনি। এ কি নেহাৎই বড়লোকের খেয়াল না আর কিছু। এমন কিছু বিরাট কবি নয় সে, যদিও আধুনিক কবি হিসেবে তার একটা স্থান আছে। তবুও। না কি এ শুধুই মন রাখা কথা। ভদ্রতা করে তুটো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সৌজন্য প্রকাশ করা। কিন্তু যদি এসব কিছুই না হয়। মনের গহনতল থেকে সত্যোপলব্ধির শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ হয় অন্য একরূপে। কোন্ সে রূপ? সে রূপে কিসের আভাস?

ঘ্যাচ করে গাড়ীটা থেমে গেল বাড়ীর সামনে। দরজা খুলে তুজনে নেমে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে একজন ছুটে আসে। গেটের দরজা খুলে দাঁড়ায়।

—আসুন।

তার পেছন পেছন দোতালার কোণের ঘরে এসে উপস্থিত হয়।

—আপনি? কখন এসেছেন?

—এই তো কিছুক্ষণ। সহাস্যে পি, এ, বলে।

—বাবা নেই বুঝি, খুব জরুরী কিছু থাকলে নোট রেখে চলে যান। রূঢ়ভাবে মিস এডেকুনলে আদেশ করেন।

পি, এ, তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর কোনও কথা না বলে মাথা নীচু করে চলে যায়।

আকুয়া ঘরের এক কোণে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে থাকে। ডিসটেমপার করা স্নিগ্ধ ঘরে সোফায় বসে সাময়িক পত্রিকা নাড়াচাড়া করতে করতে তার কেমন যেন ঝিমুনি আসে।

—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, হাত মুখ ধুয়ে আসি বড্ড অস্বস্তি লাগছে।

সামনে পত্রিকা খুলে বসলেও মন চলে গেছে অন্য কোথায়। তাড়াতাড়ি অফিস যাওয়া দরকার। নির্বাচনী আবহাওয়া অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে. মারপিট লেগেই আছে। সকলেরই এক লক্ষ্য যেমন করে হোক নির্বাচনে জিতে সরকার দখল করতে হবে। তারপর পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। এর মধ্যেই উপজাতীয় কলহ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। উত্তরের রাজ্যে আহমেদু বেল্লো নানারূপ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। পশ্চিমে আকিনতোলা ভয় দেখিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা করছেন।

মিস এডেকুনলে ফিরে এসে আকুয়ার পাশেই বসে পড়ে বললেন।

—আপনি নির্বাচনী সভায় গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, তালিম নিচ্ছি। একবছর পরেই তো কেন্দ্রের নির্বাচন। হয় তো দাঁড়াতে পারি। এ কি অবাক হলেন যে, আমি বুঝি দাঁড়াতে পারি না?

—কেন পারবেন না, আপনারাই তো দেশ, নির্বাচন, সরকার এ সব তো আপনাদের জন্যই।

—এখনো অবশ্য ঠিক নেই কিছু। যদি আমেরিকায় চলে যাই তবে আর হবে না।

—আমেরিকায় যাচ্ছেন বুঝি? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জন তার দিকে চেয়ে থাকে।

মিস এডেকুনলে মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বলে—একটা স্কলারশিপ পেয়েছি। বছর দুয়ের জন্য যেতে পারি। আপনিও চলুন না, খুব মজা হবে। উৎসাহিত হয়ে বলে সে।

—আমকে কে স্কলারশিপ দেবে বলুন।

—যাবেন আপনি? এখুনি রাষ্ট্রদূতকে ফোন করে একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দুজনে গেলে একদম খারাপ লাগবে না, মনেই হবে না যে বিদেশে এসেছি। একটা বাড়ী নিয়ে থাকব আমরা। বলুন তবে আজকেই ব্যবস্থা করি।

—একটু ভাবতে দিন। দিন কয়েক পরে জানাব।

—তাড়াতাড়ি বলবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব। আপনার কোন চিন্তা করতে হবে না। জার্নালিজম পড়ে আসবেন। বাবা একটা দৈনিক পত্রিকা বের করবে ভাবছেন। ফিরে এসে সেখানে জয়েন করবেন।

—আজকে উঠি। আবার পরে দেখা হবে।

—পরে না কালকেই। হোটেল প্যারীতে সন্ধ্যের সময় অবশ্যই আসবেন, আমি কিন্তু অপেক্ষা করব।

আকুয়া তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়। চোখের ভাষা আকুতিতে ভরা। কোন কথা না বলে সে দ্রুত নেমে যায়।

রাস্তায় নেমে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে সে। কোথায় যেন নির্বাচনী সভা হচ্ছে, মাইকের গম গম শব্দ ভেসে আসছে। মোড়ের মাথায় এসে দেখে জনকয়েক লোক জটলা করছে। কিছুক্ষণ আগেই একজন ছুরিকাহত হয়েছে। তাই নিয়ে উত্তেজনার স্রোত এখনও বইছে।

—কী দরকার আমাদের নির্বাচনের। পাঁচ বছর পর পর একবার করে ভোট দিয়ে আসা, এ ছাড়া আর কি করি আমরা।

—কিই বা করবেন। মন্ত্রী হয়ে গেলেই তো বাবুদের গেল, তারপর জনসাধারণ ডাষ্টবিনে। নিজেদের, আর শালা সম্বন্ধীর পকেট ভরলেই হল।

—দূর দূর ভোট দেবে না ছাই।

—ছেলেটা তিন বছর ধরে বসে আছে চাকরি নেই। জিনিসের দাম বাড়ছে, পথেঘাটে লোক মরছে, তার কোন সুরাহা নেই। চাই শুধু ভোট আর ভোট। ভোট নয় ছাই দেব।

বিক্ষুব্ধ মানুষের হতাশা ভরা মন্তব্য। কি হবে এ সব কথা শুনে। কান পাতলে শোনা যাবে সারা দেশময় একই বিক্ষোভবাণী।

তাড়াতাড়ি করে বাড়ী ফিরে এল আকুয়া। আজ আর কিছুই ভাল লাগছে না। মাঝে মাঝে মিস এডেকুনলের মিনতি ভরা চোখ দুটো ভেসে ওঠে। এই হাতে লেগেছিল তার কোমল আঙুলের স্পর্শ।

—কি রে জন, কখন এলি।

—আরে কাকা, কখন এসেছ। তারপর তোমাদের গাঁয়ের খবর কি? সবাই ভাল আছে।

—কিছুক্ষণ আগে এসেছি। থাকব দিন দুয়েক। গাঁয়ের জোর খবর। সব গরম হয়ে উঠেছে, নির্বাচন আসছে। আকিনতোলার জয় জয়াকার।

—সবাই এন, এন, এ-কে ভোট দেবে?

—দেবে না মানে, কাকা জোর দিয়ে বলে—না দিলে পিঠের চামড়া তুলে নেব না।

—বেশ, তবে তো তোমাদের পোয়াবার। ফসল টসল কেমন হবে এবার।

—মনে হয় ভালই হবে। ও হ্যাঁ, নারকোল বাগানের ধারে যে জমিটা ছিল, ওটা কিনেছি।

—সেটা তো রশিদ আলির ছিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ব্যাটা খেতে পায় না, দেনার দায়ে চুল বিকিয়ে গেছে জমি রাখবে কী করে। বিক্রি করে দিল। চাষের জমি হরদম বিক্রি হচ্ছে।

—জমি বিক্রি করলে কী খাবে?

—কেন ক্ষেতমজুরি করছে সবাই, নগদ পয়সা। আমরা আর কতটুকু জমি কিনেছি, উত্তরে এক একজন এমির তিন চার হাজার একর জমি নিয়ে বসে আছে।

কাকার কথা শুনে জন বিস্মিত হয়। চাষীরা ঋণের দায়ে দিনের পর দিন জমি বিক্রি করে দিচ্ছে। ছোট ছোট চাষী হয়ে গেল ক্ষেতমজুর। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকার কত আশার বাণী শুনিয়েছিল। সব নিমেষে ছাই হয়ে উড়ে গেছে।

—তবে তোমাদের অবস্থা এখন ভালই না কি বল।

—হ্যাঁ। আগের চেয়ে সুখেই আছি।

—কিন্তু এত জমি একজনের, সরকার থেকে কিছু বলে না?

—বলবে আবার কি? পকেটে কিছু গুঁজে দিলেই সব ঠাণ্ডা।

—ভালই, তুমি এখন খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম কর।

জন নিজের ঘরে এসে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়। মাথার মধ্যে দপদপ করছে। সমস্ত শরীর দিয়ে বিক্ষোভের ক্রোধাগ্নি তীব্র বেগে বের হতে থাকে। এই ক-বছরের মধ্যেই দেশের এ কী অবস্থা হোল। সারা দেশময় এক অদৃশ্য হাহাকার প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষগুলো উদভ্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য হয়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে ছুটে মরছে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য। এ এক অসহ্য অবস্থা।

॥ চার ॥

অসহ্য মেজর নজেওগয়ুর পক্ষেও। কোন রকমে বরদাস্ত না করতে পেরে হুকুম দিলেন—ফায়ার। দ্রুম্ দ্রুম্।...

বুলেট ছুটে গিয়ে পাহারারত রক্ষীর বুকে আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করল। কোন রকম প্রতিরোধ করার আগেই সে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে।

—দ্রুম। উল্টো দিক থেকে বুলেট ছুটে এসে আর একজন সৈন্যকে নিহত করেছে।

—গুলি ছুড়ছে, শুয়ে পড় সব। মেজর হুকুম দেয়।

মাটির সঙ্গে নিজেদের দেহ লেপ্টে নিয়ে বুকে হেঁটে সৈন্যরা এগোতে থাকে। প্রহরারত রক্ষীবাহিনী ভীত হয়ে এল পাথারি গুলি ছুড়তে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে গুলিগুলো শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে যায়। সৈন্যরা আবার গুলি ছোঁড়ে। দুজন রক্ষীবাহিনী খতম হল। উৎসাহে তারা হৈ হৈ করে ওঠে।

রক্ষীবাহিনী পালিয়েছে। সৈন্যরা উঠেই হৈ হৈ করে ছুটতে থাকে। পালিয়েছে সব। চল। এগিয়ে চল।

উত্তর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্যর আহমেদুর প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে সৈন্যরা। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মেজর গেটের কাছে এসে থামলেন।

অথচ ঘটনা এমন নাও হতে পারতো। উত্তর ও পশ্চিম রাজ্যে এন, এন, এ জয়লাভ করে। যার ফলে মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভ করেন স্যর আহমেদু বেল্লো এবং আকিনতোলা। পূর্বরাজ্যে ইউ, জি, পি, এ জয়লাভ করে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসায় ওকপারাকে।

দিনের পর দিন দেশের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। দাঙ্গাহাঙ্গামা

লেগেই রইল। মিলিটারীর সাহায্য নিয়েও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাচ্ছে না। দেশের সর্বত্র মিলিটারীতে ছেয়ে গেছে। বেসামরিক জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত জি, ও, সি আইরনসির অনুরোধে মিলিটারী উঠিয়ে নেওয়া হল।

দেশের এ অবস্থা কিছুতেই সহ্য হল না মেজর নজেগয়ুর। উত্তর রাজ্যের রাজধানী কাহুনা শহরে নাইজিরিয়া ডিফেন্স একাডেমির শিক্ষক নজেগয়ু জন কয়েক অফিসারকে ডেকে গোপনে আলোচনা শুরু করলেন।

—বন্ধুগণ, যদিও আমরা সামরিক বাহিনীর লোক, বেসামরিক প্রসাশনে আমাদের নাকগলানো উচিত নয় তবুও বলছি আজ দেশের এই দুরবস্থার জন্য কতগুলো অর্থগৃধ্নু অপদার্থ দায়ী। আমরা দেশের সন্তান, দেশের এই দুর্দিনে চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি না। আসুন। আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করি।

—মেজর কর্তব্য বলতে কী বলতে চাইছেন, পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

—অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করা, অপদার্থদের হাত থেকে এদের মুক্তি দেওয়া। মানুষ চায় খেয়ে পরে বাঁচতে, এরা এটুকুও দিতে রাজী নয়।

—আসুন আমরা দেশ শাসন করি। কিন্তু, কিভাবে সেটা সম্ভব।

—ক্যুপ করে।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। সবাই নিস্পন্দ হয়ে মাথা নীচু করে রয়েছে। ঘরের নিস্তব্ধতা এত প্রবল যে তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তাদের দিকে চেয়ে মেজর চিন্তান্বিত হলেন। যে চরম কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে হয় তারা সে কথায় সায় দেবে নতুবা এখুনি তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হবে।

—হ্যাঁ, ক্যুপ-ই একমাত্র পথ। একজন ক্যাপটেন বলেন।

মেজরের মুখ উজ্জলতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্তত একজন

তাকে সমর্থন করেছে। এইবার ধীরে ধীরে সবাই তার চিন্তাপথে যাত্রা করবে।

অত্যন্ত গোপনে আর সাবধানে কাজ চলতে থাকে। মেজরের মনে এক চিন্তা এ পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে কাহুনা ছাড়াও লাগোস, ইবাদান এবং এনুগুতে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সবার অলক্ষ্যে ধীরে সুস্থে ধ্রুব লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে, কেউ যেন সন্দেহ না করে।

এই সময়ে একাডেমিতে জন কয়েক অফিসার এল। মেজর ধীরে ধীরে পরিকল্পনার কথা বললেন। বিভিন্ন রাজ্যে তারা ফিরে গেল ক্যাপের খবর নিয়ে। অত্যন্ত গোপনে কাজ চললেও কিছু কিছু সৈন্য শেষ পর্যন্ত জেনে ফেলল। কিন্তু তারাও দাঁতে দাঁত চেপে রইল। চরম উত্তেজনা ধমনী দিয়ে বয়ে চলেছে।

—কি রে চললি কোথায় ?

—চুপ, সময় নেই। অপারেশন থিয়েটার দেখে আসি।

—যাব নাকি তোর সাথে।

—চলে আয়।

মোটর বাইকে করে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। রাজধানীর পথে পথে আলোকমালা, জনতার ভিড়। গাড়ীগুলো সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মোটর বাইকটা ফটফট করতে করতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে এসে থেমে গেল। এক কোণে একজন সৈন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, ওদের দেখে এগিয়ে এল।

—রুগীকে অপারেশন থিয়েটারে আনা হয়েছে।

—বহুৎ আচ্ছা। নজর রেখ। বেগতিক দেখলে ডাক্তারকে খবর দেবে।

বাড়ীটা চক্কর দিয়ে মোটর বাইকটা আবার ফিরে গেল যথাস্থানে।

—খবর কি ?

—সব ঠিক আছে।

—নার্সদের খবর দাও। সব যন্ত্রপাতি যেন সঙ্গে নেয়।

—ও কে।

জন কয়েক সৈন্য নিয়ে মেজর বেরিয়ে পড়লেন। কারুর মনে এতটুকু সন্দেহ রেখাপাত করে নি। মেজর রোজই এমনি করে আজ কিছুকাল ধরে সৈন্য নিয়ে বের হন। শিক্ষা দেবার জন্য।

সহরের মাঝখান দিয়ে তারা অগ্রসর হতে থাকে। জনসাধারণ বুটের খটখট আওয়াজ শুনে তাদের দিকে ফিরে তাকায়। কোন দিকে না তাকিয়ে একই তালে পা ফেলতে ফেলতে অগ্রসর হয় তারা। ডানে বাঁয়ে সোজা চলতে থাকে তারা। মৃত্যুপথের যাত্রী যমের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে চলেছে। জানে না, এর পরিণতি কি। শুধু এটুকু তাদের মনের মধ্যে জ্বল জ্বল করে লেখা রয়েছে দেশমাতৃকার ডাক।

—বুম্। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। মেজর ফটক লক্ষ্য করে মর্টার ছুঁড়ে মেরেছেন। বন্ধ দরজা পথ করে দেয়। মেজর তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। সিঁড়ির কাছে আসতেই তার কানের পাশ দিয়ে শোঁ করে বুলেট বেরিয়ে যায়।

—গুলি ছুড়ছে, সিঁড়ির নীচে ঢুকে পড় সব।

ওপর থেকে একজন রাইফেল তাগ করে নীচের দিকে চেয়ে রয়েছে, যে এগোবে একগুলিতে তাকে শেষ করে দেবে।

সিঁড়ির নীচে থেকে এরা বের হতে পারছে না। কতক্ষণ এমনি করে থাকা যায়। বেশী সময় নষ্ট হলে হয়তো অন্য দিক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পালাবে। পেছন দিকে ফাঁকা আওয়াজ করতেই রক্ষীবাহিনী সেই দিকে ফিরে তাকায়। সেই মুহূর্তে তার পিঠ ভেদ করে বুলেট চলে যায়। লোকটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে মেঝেতে এসে কাৎ হয়ে পড়ে থাকে।

খট খট আওয়াজ করতে করতে ওপরে ছুটে আসে তারা। রাইফেল উঁচিয়ে দৌড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। এ ঘরে কেউ নেই। দ্রুত বেরিয়ে পাশের ঘরে ছুটে যায়। না, কেউ নেই তো। তবে?

তবে গেল কোথায়? অন্য ঘর দেখ। ওপাশের ঘরে ঢোকামাত্র রিভলবারের গুলিতে সৈন্যটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর চাকর গুলি করেছে। গুলির আওয়াজে দুজন ছুটে আসে।

দুম্ দুম্। দুদিক থেকে দুজনে গুলি করে।

মুখ্যমন্ত্রী হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে যান। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সিমেণ্টের মেঝে। মেজর একবার মাত্র তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করেন। তিনি যখন এ ঘরে এলেন তখন মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণহীন দেহ তার দিকে মুখ করে নীরবে শুয়ে রয়েছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কী যেন বলতে চেয়ে ছিলেন……

স্যর আহমেদু বেল্লো, দীর্ঘকাল পরে উত্তর নাইজিরিয়ার মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদ থেকে বিদায় নিলেন।

মেজর তার মৃত দেহটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন। কি অসীম নীরবতা বিরাজ করছে। নাইজিরিয়ার বুকে যে প্রচণ্ড দাবদাহের সৃষ্টি হয়েছিল তার যবনিকা পতনের সূত্রপাত হল মাত্র। এখনও অনেক অনেক কাজ বাকি। দীর্ঘপথযাত্রায় সবেমাত্র প্রথম মাইল-ষ্টোনের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে। আরো এগোতে হবে, এগিয়ে চল।

একই সঙ্গে সামরিক অভ্যুত্থান দেখা দিল রাজধানী লাগোসে।

সাঁঝের আলো জ্বলে উঠেছে ইকোয়ি হোটেলে। কাঠের ফ্লোরে নর্তকীর চটুল পদক্ষেপ মোহময় ধ্বনি তুলেছে। টেবিলে টেবিলে রঙিন পানীয়ের ফোয়ারা। গালগল্পে মেতে উঠেছে সবাই। ঝাড় লণ্ঠনগুলো থেকে আলোর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছে। লেফটানাণ্ট কর্ণেল লারগেমা নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন।

খট্ খট্ খট্। আওয়াজ ক্রমশঃ গভীর হয়ে দরজার সামনে এসে থামে। দরজার ওপরে জোরে আঘাত দিতে দিতে বাইরে থেকে বলে—দরজা খোল।

দরজা খুলেই কয়েকজন সামরিকবাহিনীর লোক দেখে কর্ণেল

রাগে ফেটে পড়েন—হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ? কে তোমাদের এখানে আসতে বলেছে।

—কর্ণেল ইফিয়াজুয়ানার নির্দেশে আমরা এসেছি।

—কিন্তু কেন ? এর জন্য শাস্তি পেতে হবে। আই স্যাল রিপোর্ট এগেনস্ট ইউ · ।

হুম্। বুকের মধ্য দিয়ে বুলেট চলে যায়। রক্তাক্ত দেহে কর্ণেল লুটিয়ে পড়েন। হোটেলে লোকজন ভয়ে চিৎকার করতে করতে পালাতে থাকে।

—চল। প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী নিশ্চয়ই এতক্ষণ ঘিরে ফেলেছে ওরা।

সৈনিক দল মার্চ করতে করতে এগিয়ে চলে।

প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে এসে দেখে কর্ণেল ইফিয়াজুয়ানা বাড়ীটা ঘিরে ধরেছেন। তারা সেখানে যেতেই কর্ণেল রিভলবার খুলে সোজা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যান। তার পাশে পাশে রাইফেল উঁচিয়ে চলেছে সৈনিকদল।

—হ্যাণ্ডস্ আপ··। হতভম্ব হয়ে যান প্রধান মন্ত্রী। মুহূর্তে মুখের বর্ণ শাদা হয়ে গেছে। একটি কথাও মুখ দিয়ে বের হয় না। নিঃশব্দে হাত উঁচু করে আত্ম সমর্পণ করেন। দুজন সৈনিক এসে তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ীর মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়।

বন্দী প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য সবে মাত্র গাড়ীটা স্টার্ট দিয়েছে অমনি আর একটি গাড়ী এসে পাশে দাঁড়াল। সেখান থেকে লাফিয়ে নামল ক্যাপ্টেন।

—নিয়ে এস শয়তানটাকে।

দুজন সৈনিক মৃতদেহটা নিয়ে প্রধান মন্ত্রীর পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। প্রধান মন্ত্রী শিউরে উঠলেন বীভৎস দেহটার দিকে চেয়ে। মুখের কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। কপালে বুলেটের ক্ষত চিহ্ন। অর্থ-বিভাগের মন্ত্রী ওকোটিয়ে এবোহ্-এর মৃতদেহ।

ইবাদানে ততক্ষণে লড়াই লেগে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী আকিনতোলা সব সময়ে সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় থাকেন। সৈনিকদল তার বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। গেট বন্ধ প্রবেশ করার কোন উপায় নেই। মেজর এগিয়ে এসে হুকুম দিলেন—ফায়ার।

গুড়ুম্ গুড়ুম্।···গুড়ুম্ গুড়ুম্···

গুলি বিনিময় হতে থাকে উভয় পক্ষের। সশস্ত্র প্রহরীরা গুলি ফুরিয়ে যেতেই আত্মসমর্পণ করে। ক্যাপ্টেন ছুটে গিয়ে আকিনতোলাকে বন্দী করে হত্যা করে।

সেদিন রাতে জি, ও, সি মেজর জেনারেল আইরনসি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না সহরের আর এক প্রান্তে সামরিকবাহিনী কর্তৃক প্রধান মন্ত্রী নিহত হয়েছেন। হঠাৎ রাতে টেলিফোন বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

—হ্যালো, কে···কর্ণেল পাম, জি, ও, সি বলছি···হ্যালো—হ্যালো···একি গুলির আওয়াজ···

—কর্তা সব্বোনাশ সৈন্যরা রাস্তায় হল্লা করছে।

—শীগগীর ড্রাইভারকে গাড়ী বের করতে বল।

মেজর জেনারেল সোজা হেডকোয়ার্টারে এসে হাজির হলেন।

—হুকুমদার। হ্যাণ্ডস্ আপ···।

বন্দুকটা সামনে ধরে মেজর জেনারেলের সম্মুখে এসে দাঁড়াল সৈনিকটি। কঠিন কণ্ঠে মেজর জেনারেল আদেশ দিলেন—শীগগীর সরে যাও, আমি আদেশ করছি।

বজ্রকণ্ঠের কাছে নত হল সৈনিকের মনোবল। তিনি সোজা ওপরে উঠে গিয়ে মেজর এজুরকে আদেশ দিলেন পূর্বরাজ্যের রাজধানীতে তৎক্ষণাৎ যেতে।

উত্তর এবং পশ্চিম রাজ্যে ক্যুপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু পূর্বরাজ্যে কোন ব্যবস্থা না করার ফলে কর্ণেল ইফিয়াজুয়ানা মেজর ওকাফরকে নিয়ে এনুগুর পথে রওনা হয়েছেন। কিন্তু মেজর এজুর

আগেই প্লেনে এসে সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সৈনিকরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ী ঘিরে রয়েছে, মেজর এজুরের নির্দেশে সৈনিকরা চলে যায়। কর্ণেল ইফিয়াজুয়ানা এনুগুতে এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পালিয়ে যান।

রাজধানী লাগোসে মেজর জেনারেল আইরনসি সৈন্য বাহিনীর ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। সমগ্র সৈন্যবাহিনী তাঁর আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছে। রাষ্ট্রপতি আজিকিয়ে তখন লণ্ডনে।

জনসন টমাস আগুই আইরনসি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি শিক্ষালাভ করেন উমুয়াহিয়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিম আফ্রিকার তীরভূমিতে দিন কাটান। তারপর ইংল্যাণ্ড থেকে অফিসার্স ট্রেনিং নিয়ে এসে গভর্ণরের এ, ডি, সি, হন। লেফটানাণ্ট জেনারেল পদে উন্নত হয়ে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সঙ্গে তিনি কঙ্গো যান। কঙ্গোতে জনতার সম্মুখে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। দেশে ফিরে এসে তিনি জি, ও, সি-র পদ গ্রহণ করেন।

পশ্চিম ও পুর্ব রাজ্যে মেজর জেনারেল নিজের প্রভাব বিস্তার করে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে শাসন কার্য চালানোর সম্ভাবনা দেখা দিল। উত্তর রাজ্যে মেজর নজেগয়ু তখন নিজের প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত। যদিও তিনি আইরনসির মত ইবো উপজাতীয়, তবুও হৌসারা তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিল। মেজর হাসান উসমানকে উত্তরের গভর্ণর নিযুক্ত করে দক্ষিণ দিকে চললেন তিনি। মেজর জেনারেলের প্রভাব দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। নাইজার নদীর তীরে জেব্বায় এসে তিনি বাধা পেলেন মেজর জেনারেলের তরফ থেকে। শেষ পর্যন্ত তিনি বন্দী হন।

মেজর জেনারেল আইরনসি লাগোস রেডিও থেকে ঘোষণা করলেন যে তিনি নাইজিরিয়া সরকার গঠন করে দেশের শাসনভার

গ্রহণ করলেন। ছুদিনের মধ্যে পরিষদীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়ে মিলিটারী একনায়কত্বের প্রেতাত্মা গোটা দেশ জুড়ে তার লেলিহান শিখা মেলে ধরল।

শাসনভার গ্রহণ করেই মেজর জেনারেল সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বে-আইনী ঘোষণা করে দিলেন। গোটা দেশকে চারটি অঞ্চলে বিভিক্ত করে চারজন মিলিটারী গভর্ণর নিযুক্ত করলেন; উত্তর অঞ্চলে লেফটানান্ট কর্ণেল হাসান উসমান, পশ্চিম অঞ্চলে লেফটানান্ট কর্ণেল ফজুয়ি, মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে লেফটানান্ট কর্ণেল এজুর এবং পূর্ব অঞ্চলে লেফটানান্ট কর্ণেল ওজুকুয়ু। এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন লেফটানান্ট কর্ণেল গওন।

মিলিটারী শাসন হওয়ায় রাজনীতিবিদরা গা ঢাকা দিল। বেসামরিক কর্মচারীরা ভয়ে নিজেদের অভ্যাস পাল্টাতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে ছুর্নীতি আর ঘুষ দেশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। লোকে মিলিটারী শাসনের সুখ্যাতি শুরু করে দিল। মিলিটারী শাসনের প্রারম্ভে আপাত শান্তি এবং শৃঙ্খলার পরিচয় পেয়ে খুশি হয়ে উঠল জনসাধারণ। নাইজিরিয়ার জীবনে আর এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হল।

মেজর জেনারেল জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে বললেন যে তিনি চান দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করুক। জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বাস করুক, নাইজিরিয়ার ঐক্য সাধন করাই তাঁর লক্ষ্য। আগেকার শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণই হল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অনৈক্য। তিনি নতুন শাসনতন্ত্রের ঘোষণা করলেন। চারটি প্রদেশযুক্ত এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা।

মিলিটারী শাসনে কিছুদিনের মধ্যেই লোকের মনে অসন্তোষ বাসা বাঁধতে শুরু করে। উত্তরে ধনী এমিররা মেজর জেনারেলের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। যে সচ্ছলতার আশায় মানুষ মিলিটারী শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল তার চিহ্নমাত্র

কোথাও দেখা গেল না। অসহিষ্ণু জনমানস উদ্বেল হয়ে উঠল। উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গ বেসামরিক জন সাধারণের মধ্য থেকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আবার প্রাধান্য পেল আঞ্চলিকতা। ইবো আর হৌসাদের মধ্যে সৃষ্টি হল চাপা উত্তেজনা। ইংরেজরা দেশ ত্যাগের পূর্বে কৌশলে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপন করে গিয়েছিল এতদিনে ফুলে ফলে তা সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মেজর জেনারেলের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তিনি দেশ পরিক্রমায় বের হলেন।

কিন্তু তিনি জানতেন না যে, বোতলের ভূত সুযোগ পেলেই বের হয়ে পড়বে। মধ্য রাত্রি। আবেওকুতা ব্যারাকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিল। রাত এগারটার সময় একজন ক্যাপটেন বের হলেন কিছু সৈন্য নিয়ে। অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে চলতে চলতে চাপা গলায় সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন—সব ঠিক আছে?

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন।

—কারুর মনে কোন সন্দেহ জাগেনি।

—না। খুব সন্তর্পনে কাজ করেছি, শুধু জন কয়েক আমরা জানি। প্রথম গুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রাগার দখল করে নেবে। অন্যান্য ব্যারাকে সেই ভাবেই কাজ হবে।

—সব প্রস্তুত।

—প্রস্তুত।

—ফায়ার। গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম।…

তিনজন অফিসার নিহত হলেন। গুলির শব্দ শুনে ঘুমন্ত সৈনিকরা জেগে উঠল। সঠিক কিছু বুঝতে না পেরে হল্লা করতে করতে তারা জড় হল এক জায়গায়। ক্যাপটেন বজ্র কণ্ঠে হেঁকে উঠল—ব্যারাক এখন আমাদের হাতে। যারা আমাকে অনুসরণ করতে চাও তারা এগিয়ে এস। ব্যারাক দখল হয়ে গেল।

বিদ্রোহীরা হেড কোয়ার্টারে টেলিফোনে জানিয়ে দিল। সেখানেও

শুরু হয়েছে বিদ্রোহ। উত্তরে সৈনিকরা পৈশাচিক আনন্দে দক্ষিণের ইবোদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করে দেয়।

মেজর জেনারেল আইরনসি দেশ পরিক্রমায় বেরিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের গভর্ণর ফজুয়ির গৃহে এক ভোজ সভায় ছিলেন। দূর থেকে হল্লার শব্দ ভেসে আসছে। কেমন একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়া। আইরনসি কান পেতে শুনলেন, হ্যাঁ গুলির আওয়াজ।

—কেমন একটা শব্দ শুনছি।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যর।

—কিসের' গণ্ডগোল। আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছে কি ?

—এ রকম তো কোন খবর পাইনি, বিক্ষোভের আয়োজন হলে গুপ্তচর নিশ্চয়ই খবর দিত।

—তবে ? আইরনসি চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

—কিছু বুঝতে পারছি না স্যর।

—দাঙ্গা নয়তো ? হঠাৎ তাঁর মনে নতুন এক সম্ভাবনা উঁকি মারে। —দেশের এখানে সেখানে মাঝে মাঝেই দাঙ্গা লাগছে, ব্যাপার কি ! শক্ত হাতে এদের দমন করতে হবে। আমি আদেশ করছি যদি দাঙ্গা হয়, যে কোন উপায়ে দাঙ্গা বন্ধ করতে হবে, প্রয়োজন হলে গুলি চালাবেন। পেছন থেকে যারা উস্কানি দিচ্ছে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করবেন।

হট্টগোল আরো এগিয়ে এসেছে। বাড়ির দোরগোড়ায় প্রচণ্ড কোলাহলের শব্দ শোনা যায়। মেজর জেনারেল অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

—কি হচ্ছে কি এসব ? কেন এত গণ্ডগোল, কী চায় ওরা। নওয়ানকো আপনি যান তো দেখুন কী হয়েছে।

নওয়ানকো নেমে গেলেন। অসংখ্য সৈন্য জমায়েৎ হয়েছে। তার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ল তারা।

—এসেছে, এ, ডি, সি, এসেছে।

—গ্রেপ্তার কর ব্যাটাকে।

—যেন পালিয়ে না যায়।

—তবে বেঁধেই ফেল, বলা যায় না হয়তো পালিয়ে যেতে পারে।

তিন চারজন ছুটে এসে নওয়ানকোকে বেঁধে ফেলে।

সময় অতিবাহিত হয়। কেউ ফিরে আসছে না দেখে ফজুয়ি নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হন।

নিঃসঙ্গ মেজর জেনারেল চিন্তিত হয়ে উঠলেন। একে একে ওরা দুজন গেল, কিন্তু কেউ ফিরে আসছে না কেন? বাইরের অন্ধকার বিস্তৃত পক্ষ বিস্তার করে তার মনকে ছেয়ে ফেলল। কেমন একটা ছমছমে ভাব। মনের মধ্যে এক অজানা আশঙ্কা এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পদধ্বনি।

—হ্যাণ্ডস্ আপ।

—মেজর ডানজুয়ামা? কী বলছ?

--আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

—নওানকো, ফজুয়ি ওরা কোথায়?

—ওদের আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চলুন।

তিনজনকে গ্রেপ্তার করে মেজর ডনজুয়ামা চলল এক অজানা গোপন স্থানে। তিনজনেরই হাত পা বাঁধা। দ্রুতগতিতে গাড়ী এগিয়ে চলেছে। শহরের রাস্তা ক্রমে শেষ হয়ে গেল। গাড়ী চলছে গ্রামের অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন পথে। আকাশের বুকে তীব্র চিৎকার করে নিশাচর একটা পাখী উড়ে গেল। মেজর জেনারেলের মন কেঁপে ওঠে।

গাড়ী থেকে তিনজনকে নামান হল। ঘন জঙ্গল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। চারদিকে সঙ্গীন উঁচিয়ে সৈনিকরা পাহারা দেয় বন্দীদের। কারুর মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ আদেশ হল—মার্চ অন।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে কষ্ট হয়। কাঁটার আঘাতে হাত পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ওঠে। তবু যেতে হবে সামনের দিকে এগিয়ে, যতক্ষণ না থামার নির্দেশ দেওয়া হয়। নওয়ানকো খুব সন্তর্পণে হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে। তবু ভান করে রয়েছে যেন বাঁধা অবস্থায় রয়েছে সে। আরো গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছে তারা। বিরাট বিরাট মহীরুহ পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। হঠাৎ নওয়ানকো দৌড়তে শুরু করে।

গুড়ুম গুড়ুম···। গর্জে ওঠে প্রহরারত সৈনিকের বন্দুক। না, গুলি লাগেনি, পালিয়েছে। পেছু পেছু ছুটে চলে তিন চারজন সৈনিক। গাছের ডালে ডালে বসা ভয়ার্ত পাখীগুলো কোলাহল করে ওঠে। —হল্ট।

থেমে পড়ে তারা। বন্দী দুজন নির্বাক হয়ে চেয়ে রয়েছে সম্মুখে মেজরের দিকে। এর পরের আদেশ তাদের জানা। অবসাদে দেহ ভেঙ্গে পড়ছে, টন টন করছে কোমর, মুহূর্তের জন্যও দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। ইচ্ছে করে, এখানেই শুয়ে পড়ে।

—ফায়ার। বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ ফেটে পড়ে।

—ফট্ ফট্ ফট্ ফট্। গর্জন করে উঠল স্টেনগান। দেহ দুটো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

নাইজিরিয়ার একনায়কের দেহাবসান হল, শেষ হল ছ'মাসের একনায়কত্ব।

মেজর জেনারেল নিহত, এই খবর বিদ্যুৎগতিতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

লাগোসে তখন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ লেফটানাণ্ট কর্ণেল ইয়াকুবু গওন উপস্থিত ছিলেন। তিনি সরাসরি বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছিলেন বলে স্বীকার না করলেও সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তরের কার্যভার গ্রহণ করেন।

'গওন' শব্দের অর্থ বৃষ্টি সৃষ্টিকারী। তাঁর নামের সঙ্গে জীবনের যে এত মিল হবে, বোধহয় নামদাতা নিজেও জানতেন না। পৃথিবী যখন প্রচণ্ড দাবদাহে তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফট করে সেই সময় বৃষ্টিধারা নেমে এসে শুধু যে তৃষ্ণা মেটায় তাই নয়, উষর মৃত্তিকার বুকে শ্যামলিমার প্রলেপ দিয়ে যায়। নাইজিরিয়া যখন চরম ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন সেই সময় শান্তির সুস্নিগ্ধ ধারা বর্ষণ করলেন কর্ণেল গওন।

গওনের পিতা ছিলেন পাদ্রী। প্রথম জীবনে তিনি মিশন-স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, পরে অন্য স্কুলে। বয় স্কাউটের একজন উৎসাহী সদস্য এই লাজুক মুখচোরা ছেলেটি। স্কাউটে থাকার সময় তাঁকে সবাই ডাকত 'জ্যাক' নামে। পরবর্তী কালে লাগোসের কূটনীতিক মহলে তিনি 'জ্যাক দি বয় স্কাউট' নামে পরিচিত। খেলাধূলায় অত্যন্ত উৎসাহী। মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে শুধু সহখেলোয়াড়রা নয়, দর্শকরাও উৎসাহ প্রকাশ করত, আজ গওন নেমেছে, জয় সুনিশ্চিত।

নিয়মিত ভাবে স্কোয়াশ এবং পোলো খেলে নিজের সুদেহ গঠন করেছেন। অবশ্য অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার আরো কারণ রয়েছে। তিনি কখনো ধূমপান বা মদ্যপান করেন না। এখনো হয়তো তেজী ঘোড়া দেখলে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন, মনে মনে ভাবেন ভালো পোলো খেলা যেতে পারে। উনিশ বছর বয়সে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। অফিসার্স ট্রেনিংয়ের জন্য তাকে ইংল্যাণ্ডের ইটন হল এবং পরে স্যাণ্ডহার্স্টে পাঠান হয়। দেশে ফিরে এসে তিনি পদাতিক বাহিনীর অফিসার হন। কিছুদিন বাদেই আরো ট্রেনিং নেবার জন্য আবার ইংল্যাণ্ড যান। কিছুকাল তিনি রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সঙ্গে কঙ্গোতেও থাকেন। জানুয়ারী মাসের ক্যূপের সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। পরে মেজর জেনারেল আইরনসি তাঁকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন।

এই অঙ্গাস উপজাতীয় সামরিকবাহিনীর ব্যক্তিটি দীর্ঘদেহী এবং

সুপুরুষ। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দীর্ঘ ব্যক্তিটির স্বভাব কিন্তু অত্যন্ত অমায়িক। তাঁর মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। এমন কি তাঁর মুখ দিয়ে কোন সময়ে খারাপ কথা উচ্চারিত হয় না। একবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় 'নরক' (হেল) কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন বলে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি অপ্রতিভ হয়ে বলেন যে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি সৈনিক। শৈশবের মিশন স্কুলের প্রভাব তাঁর ওপরে অপরিসীম। মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় সর্বদা তিনি বিনীত ভাবে কথা বলেন।

নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে শৈশব অতিবাহিত করার ফলে সুযোগ পেয়েও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রাচুর্য চাননি। পরবর্তী কালে নাইজিরিয়া সরকারের প্রধান হয়েও তিনি ভোগবিলাসিতায় জীবন কাটাননি। বিলাসবহুল রাষ্ট্রীয় প্রাসাদে না থেকে তিনি লাগোসের উপকণ্ঠে দোদান মিলিটারী ব্যারাকে একটি ছোট্ট দোতলা বাড়ীতে বসবাস করেন। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করেন।

সহকর্মীদের প্রতি তার ভালবাসা অপরিসীম। অন্যান্য সৈনিকরাও তাকে যথেষ্ট ভালবাসে। সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁর অনেক বন্ধু নিহত হয়। তাঁদের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত হন যেন স্বজনবিয়োগ হয়েছে। তিনি বলেন সৈন্যবাহিনী একটি সুখী পরিবারের মত। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আপনজন। সৈন্যবাহিনীতে তার যথেষ্ট প্রভাব।

দেশের এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ব্রিগেডিয়ার ওগুনডিপ একদিন টেলিফোন পেলেন।

—আমি কর্ণেল ওজুকয়ু, এনুগু থেকে বলছি।

—বেশ বেশ কী খবর, আপনাদের ওখানে তো কোন গণ্ডগোল নেই।

—না। আমার একটা অনুরোধ আছে।

—বলুন।

—সৈন্যবাহিনীতে বর্তমানে আপনি সবচাইতে সিনিয়র অফিসার, আপনি দেশের কার্যভার গ্রহণ করুন।

—আমি?

—হ্যাঁ আপনি, আমার পূর্ণ সমর্থন আছে আপনার পেছনে।

—খুব চিন্তার বিষয়, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ থাকতে এ বিষয়ে চট করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে না। আপনার কথা চিন্তা করব।

বিগ্রেডিয়ার টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে নিজের কথা ভাবতে বসলেন। সমগ্র নাইজিরিয়ার প্রধান। দেশের সরকারের প্রধান হবেন তিনি! ভাবতে বেশ লাগে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, গওন ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন, সৈন্যবাহিনীতে তাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলের মিলিটারী গভর্ণর গওনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। এ অবস্থায় নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান বলে ঘোষণা করলে হয়তো প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হতে পারে। বিগ্রেডিয়ার উচ্চাশা ত্যাগ করে লণ্ডন চলে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় লাগোসের সদর দপ্তরে আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

—কর্ণেল গওন বলছি।

—গুড ইভিনিং, আমি কর্ণেল ওজুকয়ু।

গুড ইভিনিং, খবর কি? এদিকে বেশ শান্ত অবস্থা।

—দেশের এই অস্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন?

—কিছু কিছু চিন্তা করেছি; বর্তমানে লাগোসে থাকব, হয়তো দেশের শাসন ভার আমাকেই গ্রহণ করতে হবে।

—সে কি করে হয়? আপনি নিজেকে সরকারের প্রধান বলে ঘোষণা করতে পারেন না।

—উত্তেজিত হবেন না কর্ণেল, এ আমার একার ইচ্ছে নয়, সকলেই এই মত প্রকাশ করেছে।

—আমি এর প্রতিবাদ করি। নাইজিরিয়ান সরকারের প্রধান বলে আপনাকে স্বীকার করি না। আপনার চেয়েও সিনিয়ার অফিসার রয়েছে।

—থাকতে পারে, তবে মনে রাখবেন গণ্ডগোলের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমি চিফ অব দি আর্মি স্টাফ ছিলাম।

—হতে পারে। আপনার এ সিদ্ধান্ত অবৈধ।

—সিদ্ধান্ত আমার একার নয়, অন্যান্য অফিসাররা এতে মত দিয়েছেন। এ বিষয়ে আর আলোচনা করতে চাই না।

সেদিন কর্ণেল গওন নাইজিরিয়া জাতীয় সরকারের প্রধানরূপে নিজের নাম ঘোষণা করলেন। জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে তিনি বললেন যে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে গত কদিনের ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। তিনি এখন থেকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন যাতে নাইজিরিয়ার ঐক্য বিনষ্ট না হয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দেশের মঙ্গল আনতে পারেনি। সুতরাং দেশের মঙ্গলের জন্য, সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, সব কিছুর পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এই ঘোষণা হওয়ার পর থেকে কর্ণেল ওজুক্যু নানা ধরণের প্রচার করতে শুরু করলেন। গওন সরকার ঠিক মত গঠিত হয়নি বলে অভিযোগ করলেন।

বিভিন্ন দেশ গওন-সরকারকে স্বীকার করে নিলেন। পূর্বের মত কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল।

কর্ণেল গওন শাসনভার গ্রহণ করেই বুঝলেন যে দেশের ঐক্য রক্ষার জন্য শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনের প্রয়োজন। সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন কোন প্রকারেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে। বিভিন্ন অঞ্চলের মিলিটারী গভর্ণরদের ডেকে পাঠান হল।

আমন্ত্রন পেয়ে কর্ণেল ওজুক্যু প্রথমে ভাবলেন, ঐ সভায় তিনি উপস্থিত হবেন না। কর্ণেল গওন কর্তৃক আহুত সভায় যোগদানের অর্থ তাঁকে সরকারের প্রধান রূপে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন।

পূর্বাঞ্চলের কর্ণেল ওকুক্যু, উত্তরাঞ্চলের কর্ণেল হাসান উসমান, মধ্যপশ্চিমাঞ্চলের কর্ণেল এজুর এবং পশ্চিমাঞ্চলের কর্ণেল রবার্ট এডেবাও। সভার উদ্বোধন করে কর্ণেল গওন বললেন, দেশের বর্তমান অবস্থা আপনাদের অজানা নয়। এ মুহূর্তে আমাদের একমাত্র কর্তব্য দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। আপনারা যদি নিজ নিজ এলাকায় সৈন্যবাহিনীকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করেন তবে দেশ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে।

—সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এখনও দাঙ্গা চলছে। ইবো সৈনিকরা এখনো নিহত হচ্ছে। কর্ণেল ওজুক্যু অভিযোগ আনলেন।

—না। দাঙ্গা থেমে গেছে।

—সম্পূর্ণরূপে নয়। ইবো সৈনিকরা ব্যারাকে থাকা নিরাপদ মনে করে না।

—তবে কি তারা আলাদা থাকতে চায়?

—তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা চাই।

—সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা উচিত বলে আমার মনে হয়। কর্ণেল গওন বলেন।—এ বিষয়ে আপনাদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

—আমি প্রস্তাব করছি যে-সৈনিক যে-অঞ্চলের, সে বর্তমানে যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে সেই অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অবিলম্বে শান্তি ফিরে আসবে। পরস্পারের মধ্যে হানাহানি করার কোন সুযোগ পাবে না।

কর্ণেল ওজুক্যুর এই প্রস্তাব সকলেই মেনে নিল। আপাতদৃষ্টিতে এ প্রস্তাব অত্যন্ত নিরীহ বোধ হলেও, কর্ণেল গওন বুঝলেন যে এ

প্রস্তাবের কী মারাত্মক পরিণতি। কর্ণেল ওকুকয়ুর কূটবুদ্ধি তাঁরা ধরতে পারেন নি। এ প্রস্তাবের পেছনে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা আর ভেদবুদ্ধি। বিভিন্ন অঞ্চলে মাত্র সেই অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী থাকবে অথচ বেসামরিক জনসাধারণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি থেকেই যাবে। সংখ্যালঘু হবে অত্যাচারিত, অন্য অঞ্চলে দেখা দেবে তার প্রতিক্রিয়া, সমগ্র দেশ জুড়ে সব সময়ে উত্তেজনা জিইয়ে রাখার এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র রচিত হল। বিভিন্ন অঞ্চলের সংহতি বিঘ্নিত হবে, নাইজিরিয়ার ঐক্য বিনষ্ট হবে, এ কথা হয়তো তখন কারোর মনে হয় নি।'

প্রস্তাব মত পূর্বাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলের সৈনিকদের পাঠিয়ে দেওয়া হল। উত্তরাঞ্চল থেকেও ইবো সৈনিকরা আসছে। কর্ণেল ওজুকয়ু বারবার চাপ দিতে থাকেন, আরো ইবো সৈনিক অন্যান্য অঞ্চলে রয়েছে, অবিলম্বে তাদের পাঠানো হোক।

উত্তরাঞ্চল থেকে আগত ইবোরা এক ভয়াবহ চিত্র জনসাধারণের সামনে তুলে ধরল। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কিছু বেসামরিক জনসাধারণও এসেছে, তারা নানা ধরণের গুজব ছড়ায়। উত্তরাঞ্চল থেকে আগত কোন ইবোকে দেখলেই লোকে ছেঁকে ধরে, সেখানকার অবস্থা জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

—তাহলে ওখানে ইবোদের পক্ষে থাকা সম্ভব নয় ?

—একেবারেই না। মানসম্মান নিয়ে বাঁচতে গেলে ওখানে থাকা চলে না, আর যদি হৌসাদের ক্রীতদাস হয়ে থাকা যায় তবে আলাদা কথা। ছোটলোকগুলো পর্যন্ত চোখ রাঙিয়ে কথা বলে।

—তবে যারা এখনো রয়েছে তাদের অবস্থা কি রকম ?

—লজ্জায় মরমে মরে আছে, হাতে প্রাণটুকু নিয়ে কোনরকমে ধুঁকছে।

—চলে আসে না কেন সব ? একজন উত্তেজিত হয়ে বলে।

—অত সহজে কি আসা যায়, বাড়ীঘর, ধনসম্পত্তি চিরকালের জন্য ফেলে আসা সহজ কথা নাকি ?

—তা বটে।

—আপনি এলেন যে।

—না এসে উপায় ছিল না।

—কি হয়েছিল ? পাঁচ ছজন এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি বলে—সে কথা বলতে বুক ফেটে যায়।

তবু বৃদ্ধ বলে চলে সেদিনের ঘটনা। বলতে বলতে মাঝে মাঝে তার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে আসে।

সেদিন পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক এসে বলল—দাদা আর তো সহ্য হয় না।

—কেন, আবার কী হল ? নিরুত্তাপ কণ্ঠে বৃদ্ধ উত্তর দেয়।

—ইদানীং ওপাড়ার লম্বা মত হোঁপা ছোকরাটি রাস্তায় দেখা হলেই হেসে হেসে কথা বলে। ভাবতাম ছেলেটি ভাল, অন্যদের মত নয়। আমিও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছি।

ক্রমে ক্রমে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ আরো একটু গভীর হল। একদিন সন্ধ্যের পর বাড়ীতে এসে দেখে ছেলেটি বসে রয়েছে।

—কি ব্যাপার ?

—আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

—কেন ?

—এখানকার অবস্থা খুব ভাল নয়, একটু সাবধানে থাকবেন।

—তোমরা তো রয়েছ। আমার আবার ভয় কি ?

—তা হলেও। ছেলেটি লজ্জিত হয়ে বলে। চলি আজ।

—আরে বস। মেরী কফি দিয়ে যা।

মেরী কফি নিয়ে এল। ছেলেটি কফির কাপ হাতে নেবার সময়ে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইল মেরীর দিকে।

—মেরী কলেজে যাতায়াত করে। একটু সাবধানে চলাফেরা করতে বলবেন। ছেলেটি বলে।

—হুঁ। ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বলে।

সেদিনের মত সে চলে গেল। দিনকয়েক বাদে আবার এল। ভদ্রলোক বাড়ীতে এসে দেখে ছেলেটি মেরীর সঙ্গে গল্প করছে। তার সঙ্গে দুচারটি কথা বলেই চলে গেল। মেরীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তুই ওর সাথে কথা বলছিলি কেন?

—কি করব? তুমি নেই সে কথা বলা সত্ত্বেও গেল না। ক্রমে ক্রমে শোবার ঘরে চলে এল, বাধ্য হয়ে কথা বলতে হয়েছে।

—হুঁ। ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেল। তার মনে নানারূপ চিন্তার জট পাকাতে শুরু করে। ছেলেটির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। দিনে দিনে ছেলেটি বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে, যখন তখন বাড়িতে আসে, মেরীকে ডাকে, আর সে ডাকে সাড়া না দিলে রেগে ওঠে।

সেদিনও ছেলেটি এল। ভদ্রলোককে না পেয়ে ড্রইংরুম ছেড়ে শোবার ঘরে যেতে উদ্যত হতেই মেরী এসে সোফায় বসল।

—তোমার বাবা বাড়ী নেই বুঝি?

—না।

—তবে তো অপেক্ষা করতে হবে, বড্ড জরুরী দরকার।

—আমাকে বলে যান, বাবা এলে বলব।

—তোমাকে বললে হবে না। ছেলেটির চোখদুটোয় ঝিলিক খেলে গেল।

—কাজ আছে, আমি এখন ভেতরে যাব। আপনি আসুন।

—বস না। মেরীর হাত ধরে বসায় ছেলেটি।

মেরী আবার উঠে পড়ে। ছেলেটিও উঠে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রায় গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সইতে পারে না মেরী। ছেলেটির মতলব বিশেষ সুবিধের নয়, সে অনেকটা সরে দাঁড়ায়।

কিন্তু ছেলেটি এগিয়ে এসে তার পিঠে আলতো করে হাত রেখে বলে—রাগ করলে।

এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দেয় সে।

—তোমার বড্ড রাগ, ছেলেটি হাসতে হাসতে বলে।

—আপনি যান এখন। মেরী কাঁপতে কাঁপতে বলে।

—বেশ, যাচ্ছি।

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়ায়। যাবার জন্য সে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ মেরীকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে। মেরী তার দুরন্ত আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার জন্য ছটফট করতে থাকে।

—মেরী। ভদ্রলোক মেয়েকে ডাকতে ডাকতে বাড়ীতে ঢোকেন।

তাকে দেখে ছেলেটি দ্রুত বেরিয়ে যায়। ঘরে তাড়াতাড়ি এসে দেখেন মেরী মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে হতচেতনের মত। মেয়ের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে বাবা। একটি লাঞ্ছিত, বিধ্বস্ত দেহ। ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এসে চোখে মুখে ছিটোতেই সে চোখ মেলে চায়। চোখ মেলে বাবাকে সম্মুখে দেখে কোলের মধ্যে মুখ গুজে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। বোবা চাহনিতে নির্বাক হয়ে থাকে পিতা অপমানিত সন্তানকে কোলে নিয়ে।

—আপনারা বলুন এর পর আর সেখানে থাকতে সাহস হয়। ধন-সম্পদ গেছে, শুধু প্রাণ হাতে নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি, আপনজনদের কাছে ফিরে যাচ্ছি এই ভরসাতে এসেছি, জানিনা এখানে কপালে কী আছে।

—কোন ভাবনা নেই আপনার, আমরা আপনাকে দেখব।

—কিন্তু আরো তো অনেকে আছে, তাদের কী হবে।

- জানিনা, হোঁসাদের দয়া !

—ওদের দয়ায় আমাদের বাঁচতে হবে ! একজন ব্যঙ্গ করে বলে।

—বড্ড বা[illegible]

—ঐ মেয়েটির নামে শপথ, এর প্রতিশোধ নেব। একটি ছেলে উত্তেজিত হয়ে বলে।

—ঠিক এখানে চাপ দিলে ওখানে ঠাণ্ডা হবে। নিজেদের জান প্রাণ দিয়ে বোঝ অপরকে আঘাত করলে তার কেমন লাগে।

উত্তেজনা আর গুজব বায়ু তাড়িত অগ্নিশিখার মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্রই একই ধরণের আলোচনায় রসনা মুখর হয়ে ওঠে। অশান্ত মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে আরো কিছু ইবো উত্তরাঞ্চল ছেড়ে চলে আসে। তাদের পলায়নের লোমহর্ষক কাহিনী শুনে স্থির হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

পূর্বাঞ্চলে হৌসাদের ওপর অত্যাচারের খবর অনেক পথ ঘুরে ডালপালা বিস্তার করে, পল্লবিত হয়ে যখন এল, হৌসারা প্রথমে আচ্ছন্ন হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে আকাশের দিকে মুখ করে চিৎকার করে উঠল—রক্ত চাই। গ্রাম থেকে সহরে, নগর থেকে প্রান্তরে সেই ধ্বনি উত্তাল হয়ে প্রতিধ্বনিত হল রক্ত চাই, রক্ত চাই! উত্তরাঞ্চলের দিকে দিকে জেহাদ ঘোষিত হল। প্রাণ ভয়ে ইবোরা ছুটতে থাকে মৃত্যুর পারোয়ানা হাতে নিয়ে। প্রতিরোধের বালির বাঁধ ভাসিয়ে নিয়ে যায় উন্মত্ত মানুষকে।

রাত্তিরে তারা নিশাচরের মত এসে দাঁড়ায় সাবোন ঘেরির ধারে। অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের দেহ লীন করে চুপচাপ ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ায়। চাপা কণ্ঠে একজন জিজ্ঞেস করে—মশালগুলো এনেছিস।

—হ্যাঁ, এই যে।

—সবার হাতে হাতে দে। পাঁচজন পাঁচজন করে চার ভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে চল।

—মশালগুলো জ্বালাব কখন।

—মুখে সিটি দেব, সঙ্গে সঙ্গে মশাল জ্বেলে নিবি, শুধু খেয়াল

রাখিস যে-ঘরে ঢুকবি সেখানে যেন কিছু রেখে আসিস না। চল সব।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে তারা। প্রাচীরের ভেতর দিয়ে মাঠের মধ্যে বাড়ীগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। কোনও কোনও বাড়ীতে তখনো আলো জ্বলছে, কেউ কেউ জেগেও আছে। একটা ঘর থেকে বাচ্চা ছেলের কান্নার শব্দ ভেসে আসে। ক্রন্দনরত ছেলেকে শান্ত করে আবার ঘুম পাড়ায় মা।

—কু-উ ই-ক্। বুক কাঁপানো সিটি বেজে ওঠে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মশালগুলো। সেই আগুনের আলোয় চোখ মুখ ভয়ংকর দেখায়। ধমণীর মধ্য দিয়ে বয়ে যায় লাভা-স্রোত।

—হা-রে রে রে রে।···

বুক কাঁপানো তীব্র চিৎকারে সবার ঘুম ভেঙে যায়। ভয়ার্ত মানুষগুলো নিজেদের ঘরে আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে বিহ্বল হয়ে ওঠে। স্ত্রী নিরাপত্তার জন্য স্বামীর বুকে মুখ গুজে আশ্রয় খোঁজে। মাতা সন্তানকে আঁচল দিয়ে ঢাকে নিরাপত্তার জন্য। ভাই বোনের হাত ধরে বাঁচানোর নিষ্ফল চেষ্টা করে। অক্ষম পিতা জোয়ান ছেলের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে আবেদন জানায়।···

আবার আকাশের বুক চিরে ধ্বনিত হয় এক ভয়ংকর হুংকার।···

এক হাতে মশাল আর এক হাতে উন্মুক্ত অস্ত্র। ঘরে ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে তারা। ঘরে ঢুকেই মশাল ছুড়ে ফেলে দেয় কাপড় চোপড়ের উপর। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। চিৎকার করে পালানোর চেষ্টা করে কেউ কেউ।

ঘরে ঢুকেই বাড়ীর কর্তাকে দেখে তার বুকের মধ্যে ছোরাটি বসিয়ে দেয়। কোন কথার বলার আগেই দেহটি লুটিয়ে পড়ে। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। ঘরের এক কোনে তার স্ত্রী বাচ্চাকে কোলে নিয়ে কাঁপছে থরথর করে। ছেলেটির একটা হাত ধরে টান দেয় লোকটা। ছেলেটিকে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে মা।

বাচ্চাটার হাত ধরে আবার টান দেয়। চিৎকার করে দরজার দিকে এগোতে গিয়েই এক ধাক্কা খেয়ে পেছনে উল্টে পড়ে যায়। কোল থেকে ছিটকে পড়ে বাচ্চাটা কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে।

—চুপ চুপ। আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে মায়ের দিকে এসে তার চিরযন্ত্রনা শেষ করে দেয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সমস্ত অঞ্চলটা আলোয় উদ্ভাসিত। অসংখ্য আর্তমানুষের কোলাহলে অন্তস্থল বিদীর্ণ হয়ে উঠছে।

ধর ধর। একদল লোক তাড়া করেছে একজনকে। সে প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে। আরো জোরে•••আরো জোরে•••এসে পড়ল বলে। পেছনে একদল লোক ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। রাস্তার ধারে একটা গাছ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তার পেছনে লুকিয়ে পড়ে। লোকগুলো ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। একসঙ্গে সবাই সকলের দিকে বোকার মত চেয়ে থাকে। অন্ধকারের মধ্যে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

—যাবে কোথায়। এখানেই কোথাও আছে, ভাল করে দেখ চারিদিকে। একজন দেখতে পেয়েই দৌড়ে ধরতে যায়। লোকটি আবার ছুটতে শুরু করে। প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে। পেছনে হৈ হৈ করতে করতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসে তারা। লোকটা আরো জোরে ছুটতে গিয়ে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। উল্লাসে ফেটে পড়ে তারা।

লোকটা আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করার আগেই একজন দৌড়ে এসে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মাথায় ঘা মারতে ঘুরে পড়ে যায় লোকটা। মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে সে। তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ দূর প্রান্তরে মিলিয়ে যায়। ধীরে ধীরে লোকটা উঠে বসে। মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে মুখের ওপর দিয়ে নামছে। একটা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। ধুলোকাদা রক্তমাখা বীভৎস মুখ!

—দম নিতে দে, দেখিস আবার না পালায়।

—এই পালাবি নাকি, এমুগুতে যাবি। বলেই লোকটার চোয়ালে মারল প্রচণ্ড ঘুষি। লোকটা মাথাটা বার দুয়েক শূন্যে দুলিয়ে আবার উপুড় হয়ে পড়ে গেল। পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন তাকে তুলে ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে ধরে দাঁড়ায়, আর সবাই মিলে চড় ঘুষি কিল মারতে থাকে। লোকটাকে দেখে আর মনে হয় না যে মানুষ। মুখটা ফুলে নরম মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। তার আর কোন জ্ঞান নেই। দুজন তার সার্ট ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় রাস্তার ওপর দিয়ে। টানতে টানতে একটা গাছের ধারে এসে তারা দাঁড়ায়। তারপর গাছের ডালের সঙ্গে লোকটাকে ঝুলিয়ে দেয়।

হৈ হল্লা করতে করতে এগিয়ে চলে তারা। চতুর্দিক থেকে কান্না আর আর্তস্বর শোনা যাচ্ছে। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশের বুক ছুঁয়ে আরো ওপড়ে ওঠার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে পৈশাচিক বিকট অট্টহাসি শোনা যায়। ঘণ্টা কয়েক ধরে এই তাণ্ডব লীলা চলতে থাকে। বিধ্বস্ত ইবো পল্লীর ধ্বংসস্তূপ নীরবে এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে থাকে।

সাম্প্রদায়িকতার বারুদ স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ ঘটায়। দাঙ্গার উষ্ণ উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে একে একে বিভিন্ন সহরে গ্রামে।

মাকুরদি, মিন্না, গবোকো, গম্বে, সকোতো, কাতুনা সহর দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে আগুনে আত্মাহুতি দেবার জন্য ইবোদের সারিবদ্ধ করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

তবুও আগুনের আঁচের বাইরে যারা ছিল তারা প্রাণভয়ে সব কিছু ফেলে শুধু প্রাণটুকু কোনরকমে হাতের মুঠোয় নিয়ে পালাতে থাকে পূর্বাঞ্চলে।

অসংখ্য লোক উত্তরাঞ্চল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, গাড়ীতে, পায়ে হেঁটে অসংখ্য লোক চলেছে। শরনার্থীর দল।

পূর্বাঞ্চলে তারা গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। স্টেশনে স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়। বাসে ঝুলতে ঝুলতে লোকে চলেছে, কেউ আর একটা দিনও এখানে থাকতে চায় না, প্রাণরক্ষার তাগিদে সব কিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওখানে গেলে অন্ততঃ প্রাণের ভয় নেই, সহানুভূতি পাবে সরকারের কাছ থেকে, বেসরকারী সংস্থার কাছ থেকে।

ওরা আর কোন উপায় না দেখে হাঁটতে শুরু করে। মাকে নিয়ে ওদের ভাবনার অন্ত ছিল না, অসুস্থ শরীরে হাঁটতে পারবে কিনা কে জানে। কিন্তু নিজের চাইতেও ছেলেমেয়ের প্রাণরক্ষা বড় হয়ে দেখা দেওয়ায় জোর দিয়ে বলল, আমার জন্য কোন চিন্তা নেই, দেখবে, আমি ঠিক যেতে পারব।

—রাস্তা তো নেহাৎ কম নয়, তার চেয়ে চল ট্রেনেই যাই। আতঙ্কিত স্বামী বলে।

—ট্রেনের অবস্থা তো দেখেছ, হয়তো দুতিন দিন স্টেশনেই বসে থাকতে হবে। আর সেখানে যে প্রাণ নিয়ে বসে থাকতে পারব তার নিশ্চয়তা কোথায়?

—সে অবশ্য ঠিক। কালকেও নাকি একটা ট্রেন লুঠ হয়েছে। মরেছেও বেশ কিছু।

—তার চেয়ে এক কাজ কর বাবা, তুমি মাকে নিয়ে বাসে চলে যাও, আমি আর দাদা হেঁটেই যাব। কোনরকমে নসুক্কায় গিয়ে পৌছতে পারলে তারপর যা হয় দেখা যাবে।

—সে হয় না, যা হবে, সকলের একসঙ্গেই হবে। আমার জন্য তোদের কোন চিন্তা নেই। ব্যাকুল হয়ে মা বলে।

বহুদূর থেকে হল্লার ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে। চারটি শঙ্কিত মানুষ উৎকর্ণ হয়ে শোনে, আরো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। কারোর মুখে কোন কথা নেই, তারা একজন অপরজনের দিকে তাকায় শুধু। আবার গগনভেদী শব্দ হল। এ শব্দের অর্থ তাদের কাছে সুস্পষ্ট। স্বয়ং মৃত্যু এ শব্দের মধ্য দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে। চতুর্দিকে

কোলাহলের হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ভয়ংকরের রুদ্রলীলা চোখের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অসংখ্য কাহিনা তারা শুনেছে, দেখেছে নিজের চোখে রাস্তার ধারে ধারে পড়ে থাকা মৃতদেহ।

বোবা মুখগুলো শূন্যদৃষ্টি মেলে ধরল। হঠাৎ তাদের মধ্যে কোথা থেকে এক অদ্ভুত প্রেরণা এসে তাড়িয়ে নিয়ে চলল অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে।

ওরা হাঁটতে শুরু করেছে। সঙ্গে সামান্য কিছু জিনিসপত্র আর টাকা পয়সা। গ্রামের পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছে। মাথার ওপরে সূর্য। একটা গাছের ছায়ায় সবাই হাঁফাতে থাকে। ভদ্রমহিলা পুটলি খুলে প্রত্যেকের হাতে খাবার দেয়। কোন কথা না বলে সবাই নির্বিবাদে সেই খাদ্য খেয়ে নেয়। আজ আর কোন প্রশ্ন নয়, কোন জিজ্ঞাসা নয়, শুধু মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এক নিদারুণ প্রয়াস।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটার সময় একবারও শ্বাপদ জন্তুর কথা মনে হয়নি, মনের মধ্যে জঙ্গলের ভয়ংকরতা একবারও উঁকি মারেনি। শুধু বার বার মনে হয়েছে দ্রুত পা চালিয়ে যেতে হবে ঐ দূরে—যেখানে নিরাপত্তা তার উষ্ণ কোল পেতে রেখেছে সবার জন্য।

হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রমহিলা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তারা তিনজন ছুটে এসে ঘিরে ধরল তাকে। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—মুখে চোখে জল দাও।

—দাদা দেখতো হাওয়া দেওয়ার কিছু জোগাড় করতে পারিস নাকি।

ছেলেটি এদিক ওদিক ঘুরে একটা বড় পাতা নিয়ে এল। তাই দিয়ে হাওয়া দিতে শুরু করে। কিছুক্ষণ বাদেই চোখ মেলে চায়। পাশে বসে থাকা স্বামীর একটা হাত ধরে চিৎকার করে ওঠে। সমস্ত শরীরটা বেঁকে আবার সোজা হয়ে নিথর হয়ে যায়।

—খোকা দেখ তো কী হল।

—ছেলেটি মায়ের মুখের ওপরে ঝুঁকে ডাকতে থাকে—মা, মা। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বাবার মুখের দিকে মুখ তুলে এক অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে থাকে।

মেয়েটি মায়ের নাকের কাছে নিজের মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে ডাকে—মা, মাগো। তার পরেই আর্তনাদ করে কেঁদে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই কেঁদে ওঠে।

একটা দীর্ঘশ্বাস আর মৃতদেহটি পেছনে রেখে ওরা এগিয়ে চলল। নির্বিঘ্নে জঙ্গল পেরিয়ে গাঁয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে তারা।

—বাবা!

—কি? চমকে উঠে প্রশ্ন করেন। ছেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে দ্রুত পা চালান তিনি।

একটা লোক খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের দেখছে। মেয়েকে মাঝখানে রেখে তারা বারবার পেছনে চাইতে চাইতে এগোতে থাকে। লোকটা মাঠে কাজ করছে। তিনজন অচেনা মানুষকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখে তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে রয়েছে শুধু বিস্ময়। আর জীবনে পোড়-খাওয়া এই অবিশ্বাসী মানুষগুলো আরো ভীত হয়ে ওঠে। কোন কথা না বলে তারা দৌড়াতে শুরু করে। অনেকক্ষণ দৌড়েও যখন দেখল কেউ পেছু পেছু তাড়া করছে না তখন তারা হাঁফাতে হাঁফাতে থেমে গেল।

—তোর কষ্ট হচ্ছে, না রে খুকু।

—না বাবা, তোমার পা কেমন ফুলে উঠেছে।

—কোথায়, ও তো আগে থেকেই ছিল। তুই বুঝি এতদিন লক্ষ্য করিস নি।

মেয়ে নীরবে বাপের ছলনাটুকু স্বীকার করে নিল। আর না করে উপায়ই বা কী।

—এখন কি একটু বসবে বাবা।

—আর চলতে পারছিস না।

আমি পারছি, তোমার অসুবিধে হচ্ছে, একটু বিশ্রাম করে নাও না বাবা।

—না থাক, আর এই তো এসে গেছি। এই সামান্য পথটুকু পেরুতে পারলেই নিরাপদ। চোখদুটো আশায় জ্বল জ্বল করে ওঠে ভদ্রলোকের।

—সেখানে কোথায় গিয়ে উঠব।

—আমার পিসতুত ভাই আছে, দেখবি বেশ যত্ন করবে। আর তা ছাড়া সরকার থেকে কত রেফিউজি ক্যাম্প করেছে।

—দাদা, বাবার হাতটা ধর তো, কেমন কাঁপছে বাবা।

—না না তোর কোন ভয় নেই। এই গ্রামটা পেরুলেই একটা ছোট্ট সহর দেখা যাবে, সেখানে আজকের মত অপেক্ষা করে কাল আবার রওনা দেব। কালকেই পৌঁছে যাব। এসেই গেছি রে। আর ভয় নেই।...

সন্ধ্যে নাগাদ তারা সেই সহরটায় এসে পৌঁছল। ছোট সহর, অল্প লোকজন, পথেঘাটে জনতার ভিড় নেই। শান্ত নির্লিপ্ত জীবন। মৃত্যু এখনো এখানে হাতছানি দেয়নি। পুরোপুরি হৌসা এলাকা, কিছু কিছু অন্যান্য উপজাতি রয়েছে কিন্তু ইবো প্রায় নেই বললেই চলে।

যেখানে গিয়ে তারা উঠল সেখানে আরো জন পনের কুড়ি ইবো এসে জমেছে। প্রত্যেকের চোখেমুখে শঙ্কার ভাব স্পষ্ট। সন্দিগ্ধ মনে পৃথিবীর দিকে চায়, জীবনের সবরকম বিশ্বাস হারিয়ে এরা এক-বিশেষ শ্রেণী হয়ে উঠেছে।

রাতের আঁধার নেমে আসতেই তারা আরো ভীত হয়ে উঠল। ঘন হয়ে নিজেদের একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে এরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি হয়ে থাকে।

—রাতে সজাগ থাকতে হবে।

—মেয়ে আর বাচ্চাগুলোকে ঘিরে থাকবে সবাই।

—সব সময় পালা করে দুজন পাহারা দেবে। বিপদের আঁচ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই উঠে পড়বে।

—তারপর কি হবে?

—তারপর? তারপর কেউ জানে না। আর সেই 'তারপর' মাঝরাতের একটু পরেই চরম বিভীষিকার মত কালো ডানা মেলে নেমে এল।

—উ-হু-হু-হু।...এক বিকট চিৎকার তীব্রগতিতে ছুটে এল। এই সন্ত্রস্ত জনকুড়ি লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে লাগল। লোকগুলো হুড়মুড় করে এসেই সমস্ত জায়গাটা লণ্ডভণ্ড করে দিতে থাকে।

একজন এসে ভদ্রলোকের হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিতেই চেঁচিয়ে ওঠে—খোকা আমায় মেরে ফেলল রে।

তার ছেলে কাল বিলম্ব না করে লোকটির নাকের ওপরে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারে। রক্তাক্ত নাক ধরে লোকটা উল্টে পড়ে যায়। আর একটা ঘুষি মারবার জন্য হাত তুলতেই পেছন থেকে একজন এসে ছোরা বসিয়ে দেয়।

—বাবা গো। বলেই ছেলেটি ঢলে পড়ে।

—তুই ছেলের নাম কর। বলেই লোকটা ভদ্রলোকেরও পেটের মধ্যে ছুরি বসিয়ে টেনে দেয়।

ছেলের ওপরে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকে ভদ্রলোক। তাণ্ডব ততক্ষণে পুরোদমে শুরু হয়েছে। চিৎকার, হইহল্লা, ছোট ছেলে-মেয়েদের কান্নায় আবহাওয়া ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

মেয়েটি এই সুযোগে ছুটে অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে ঢেকে ফেলে। তারা সবাই এত উন্মত্ত ছিল যে কেউ খেয়াল করেনি কোন সুযোগে সে তাদের দৃষ্টি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। যখন সে কিছুটা দূরে গিয়ে দৌড়তে শুরু করে তখন একজন হঠাৎ দেখে ফেলে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর মেয়েটি

আবার দৌড়য়। লোকটি কিন্তু একটু দৌড়েই তাকে ধরে ফেলে। চতুর্দিকে নিঃসীম অন্ধকার, অন্তত আধ মাইলের মধ্যে কেউ নেই। লোকটি মেয়েটির হাত ধরে দাঁড়ায়।

থরথর করে কাঁপছে মেয়েটি, চোখদুটো দপদপ করছে এই মুহূর্তে তার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

সর্বত্রই উন্মত্ততা। সংবাদপত্রগুলোয় দাঙ্গার বিস্তৃত বিবরণ। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অসংখ্য ঘটনা মানুষ চাক্ষুষ দেখে শিউরে ওঠে। রিপোর্টাররা ঘুরে ঘুরে এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদও চিত্র সংগ্রহ করছে।

টাইম পত্রিকায় লেখা হল ঃ—লণ্ডন থেকে একটি বিমান এসে থামল। কোনো যাত্রীদের প্রহরাধীনে শুল্ক অফিসে নিয়ে যাওয়া হতেই বন্যদৃষ্টি নিয়ে সৈনিকরা হুল্লোড় শুরু করে দিল। রাইফেল উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—হতভাগা ইবোরা কোথায়? শুল্ক অফিসার-দের মধ্যে যারা ইবো ছিল তারা হাতের চক ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল। কিন্তু পথিমধ্যে অপর সৈনিকের গুলিতে তাকে নিহত হতে হল। ···হৌসা বাহিনী বিমান বন্দরকে কসাইখানায় পরিণত করল। বারে ইবো কর্মচারীদের ওপর বেয়নেট চার্জ করে, করিডরে গুলি চালান হল। ইবো যাত্রীদেরও সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি চালান হল।

অবসারভার কাগজে এই দাঙ্গার বিবরণ দেওয়া হল ঃ—

নারী পুরুষ শিশু ভাঙ্গা হাত পা নিয়ে পৌছল, তাদের হাত কাটা, মুখ কাটা।

ডেলি এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা জানালেন ঃ—

আমি দেখলাম শকুনি এবং কুকুর ইবোদের মৃতদেহ নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করছে।

দাঙ্গার প্রচণ্ডতায় স্বাভাবিক জীবন যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। গ্রামে শহরে মৃত্যুর হাহাকার। কর্ণেল হাসান সৈন্যবাহিনীকে যে

কোন উপায়ে দাঙ্গা বন্ধের নির্দেশ দিলেন। কর্ণেল গওন বেতার বক্তৃতায় জানালেন যে এই দাঙ্গা দায়িত্বহীনতা এবং হটকারিতার পর্যায়ে এসেছে। একে যেমন করে হোক বন্ধ করতেই হবে।

হঠাৎ জন আকুয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ায় অশোক খুশি হয়ে উঠল।

—এনুগুতে কবে এলেন।

—কাল এসেছি। আপনি ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ, ব্যাপার কি ? বিশেষ কোন কাজ আছে।

—ব্যাপার তো এখন এনুগুতে, সব গরম গরম খবর ! লাগোসে থাকতে আমরা দিনরাত কত খবর শুনতাম।

—সব গুজব। অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবন যাত্রা এখানে।

—সে ঠিক। তবে আওলোও এনুগুতে এসেছেন, জানেন ?

—না তো, কারণ কি ?

—খুব তাৎপর্যপূর্ণ, মুক্তির পর বোধহয় আবার রাজনীতিতে প্রবেশ করার ইচ্ছে হয়েছে।

—কিন্তু পূর্বাঞ্চলে কেন ? এখানে তিনি কি সুবিধে করতে পারবেন ?

—কর্ণেল ওজুকয়ুর সাহায্যে যদি কিছু হয়।

—চলুন আমার হোটেলে একটু আড্ডা দেওয়া যাবে, যদি অবশ্য সময় থাকে আপনার।

—চলুন, আপনার ডাক উপেক্ষা করলে হয়তো পরে পস্তাতে হবে। দুজনে হেসে ওঠে হো হো করে।

হোটেলে এসে দু'কাপ কফির অর্ডার দিয়ে অশোক আরাম করে বসে।—তারপর বলুন আপনার খবর।

—সবুর করুন, একটু সুস্থির হয়ে বসি। আপনিও যে মিলিটারী অফিসার হয়ে উঠলেন।

দুজনেই আবার হেসে ওঠে। বেশ যুৎসই করে বসে নিজে একটা

সিগারেট ধরিয়ে অশোককে আর একটা দিয়ে এক মুখ ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—বলুন আপনার বক্তব্য।

—বলবেন তো আপনি, রাজধানী থেকে ফিরেছেন খবরের বোঝা নিয়ে।

—এটাও তো রাজধানী, আর এখানকার সরকার তো গওন সরকারকে মানছে না।

—ব্যাপার কি বলুন তো ?

—কিছু বুঝছি না। তবে মনে হয় এর পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে।

—আমারও অনুমান, বিশেষ করে পশ্চিমী কূটনৈতিক তৎপরতা খুব বেড়ে গেছে।

—পৃথিবী জুড়েই পশ্চিমীদের নতুন নতুন খেলা শুরু হয়েছে। কঙ্গোতে এদের বিচিত্র খেলা আমরা আগেই দেখেছি।

বেয়ারা এসে কফি দিয়ে গেল।

নিঃশব্দে দুজনে কফি পান করতে থাকে। দিনে দিনে ঘটনা কেমন যেন জটিল হয়ে উঠেছে। কর্ণেল গওন দেশে শান্তিরক্ষার জন্য সব রকমে চেষ্টা করছেন। দেশে নতুন শাসনতন্ত্র চালু করার জন্য সভা ডেকেছেন। শাসনতন্ত্র খসড়ার জন্য এ্যাডহক কনষ্টিটিউশন্যাল রিভিয়্যু কনফারেন্স হয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ফলই হল না।

—কনফারেন্সের সময় আপনি লাগোসে ছিলেন। অশোক জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ। কনফারেন্সে কোন ফল হল না, ভেঙ্গে গেল। আপনার কি মনে হয়।

—কিছুই না। পূর্ব নাইজিরিয়ার হাবভাব বোঝা মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

—কি রকম ?

—সে অনেক কথা। জন আকুয়া বলতে শুরু করে।

দেশে শাসনতন্ত্র প্রচলন করার জন্য গওন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত করার উদ্দেশে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি এক সভা করলেন। তাঁর মূল প্রস্তাব ছিল নাইজিরিয়াকে দশ বারোটি রাজ্যে বিভক্ত করে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিরা সে প্রস্তাবে বাধা দিলেন। তাঁদের মত, একটি কনফেডারেশন গঠন করা হোক অর্থাৎ রাজ্যগুলোর অবাধ স্বাধীনতা থাকবে, শুধুমাত্র বৈদেশিক ব্যাপারে পরস্পর একত্র হয়ে নীতি অনুসরণ করবে। নাইজিরিয়ার ঐক্য রক্ষার জন্য উত্তরের প্রতিনিধিরা এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তাঁরা জানালেন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার না থাকলে দেশের ঐক্য রক্ষা করা মুস্কিল হবে। সভা তারপর স্থগিত হয়ে যায় পরবর্তী এক তারিখ স্থির করে। কিন্তু পরবর্তী তারিখে পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত থাকেন। তাদের বক্তব্য লাগোসে তাদের জীবনের দায়িত্ব কে নেবে। তাঁরা অনুপস্থিত হলেও শাসনতন্ত্র খসড়ার জন্য এক কমিটি গঠিত হল, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করবেন।

এতে কর্ণেল ওজুকয়ু অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশ করলেন।

—দেশের যা অবস্থা তাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশঃ অবনতির পথে চলেছে।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চল উদ্বাস্তু সমস্যায় ভীষণভাবে বিব্রত। হাজার হাজার উদ্বাস্তুর পুর্নবাসন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিল তারও কোনও সুরাহা হয়নি। যাক আজ চলি।

—চলুন। আমিও একটু বেরুব।

রাস্তায় এসে দাঁড়াল দুজনে। জমজমাট রাস্তা। মানুষ নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। হকার সান্ধ্য-দৈনিক ফিরি করছে। দেশের অবস্থা জানার জন্য সবাই উদগ্রীব।

—চলি আজ।

—আবার দেখা করবেন। একটা বাসে উঠে বসল আকুয়া।

অশোকের আজ বিশেষ কোন কাজ নেই। এখুনি নির্বান্ধব হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে করে না। অথচ যাওয়ারও কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। সাত পাঁচ ভেবে সে একটা বাসে উঠে বসল।

বাসটা কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল। পাশ দিয়ে একটা মিছিল চলেছে। মিছিল থেকে অসংখ্য মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বোধহয় ওয়ার্কার্স এণ্ড ফার্মার্স পার্টির মিছিল। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর উদ্দেশে মিছিল বের করেছে। অনেক লোকেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। নানারকম কটু মন্তব্যও শোনা যায়।

বাসটা আবার চলতে শুরু করেছে। বাসের মধ্যেই অশোক মনস্থির করে ফেলল। মীরা মেহতার ওখানে যাবে। অনেকদিন দেখা হয় নি।

বাড়ীটার সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। বেশ বড় বাড়ী। মিঃ-মেহতা সুদূর ভারতবর্ষের গুজরাটের এক পল্লী থেকে এখানে এসে নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছেন।

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দাঁড়াল বাড়ীর চাকর।

—বসুন দিদিমণিকে ডেকে দিচ্ছি।

অশোক সোফায় গা এলিয়ে দেয়। সামনের টেবিলে কতগুলো সাময়িক পত্রিকা। একটা কাগজ তুলতে গিয়েও আবার হাত সরিয়ে নিল। এই ধরণের কাগজগুলোর সম্বন্ধে তার কেমন যেন অনীহা।

—এ কি মিঃ রয় আপনি।

—প্লীজ আপনি একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি।

—না না কী যে ঠাট্টা করেন।

—ঠাট্টা আবার কি, মেয়েরা সংসারের কাজ করবে এতে ঠাট্টার কি দেখলেন।

—উঃ, আপনি বড্ড বাজে বকেন। একজন লোক এসেছেন, তার সঙ্গে ছবি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করছি। আপনি বসুন, এখুনি আসছি।

আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মীরা বেরিয়ে গেল। অশোক তার দিকে চেয়ে রইল অবাক দৃষ্টিতে।

মীরার আসতে যেন একটু বেশী দেরী হচ্ছে। অশোক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পা টিপে টিপে পাশের ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে। ভেতর থেকে আর একজন মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। হঠাৎ একটা কথা কানে যেতেই সে উৎকীর্ণ হয়ে উঠল।

—পূর্ব নাইজিরিয়াকে বেরিয়ে আসতেই হবে। দেয়ার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ।

—বের হওয়া অতই সহজ, কেন্দ্রীয় সরকার চতুর্দিক ঘিরে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে পারে, এমন কি মিলিটারী এ্যাকসন নিতে পারে।

—নিতে পারে নয়, নিশ্চয়ই নেবে, এমন কি সোভিয়েতের সাহায্যও পেতে পারে। তবুও।

—কিসের ভরসায় পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হবে, তার মিলিটারী শক্তি

—যতটুকুই হোক, সে সব ভাবনা তাকে ভাবতে হবে না, ঠিক পেয়ে যাবে, সে ব্যবস্থা করা হবে। কালকে টি সিক্স-এর সঙ্গে দেখা করবে। আজ চলি।

অশোক দ্রুত সরে গিয়ে নিজের যায়গায় বসে একটা পত্রিকার পাতা উল্টোতে আরম্ভ করে।

মহিলার সঙ্গে সঙ্গে মীরা বেরিয়ে আসে। একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা গট গট করে হেঁটে বেরিয়ে যান।

—তারপর, অশোকবাবু একেবারে পাত্তাই নেই যে। মীরা আবার তার পাশে এসে বসে।

—দিন কয়েক একদম সময় পাইনি। রোজই ভাবি আপনার সঙ্গে দেখা করব কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠে না।

—বেশ মন রেখে কথা বলতে শিখেছেন তো।' মুচকি হেসে মীরা বলে।

—শিখলাম আর কই, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশোক বলে।

—দুঃখ হচ্ছে বুঝি, খিল খিল করে মীরা হেসে ওঠে।—দেখবেন অপরের মন রাখতে গিয়ে আবার নিজের মন হারিয়ে ফেলবেন না।

—বিশ্বাস করুন মিস মেহতা চেষ্টা করেও হারাতে পারি না, দেখি ঠিক যায়গায় রয়েছে। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে অশোক বলে।

—বসুন একটু কফি আনতে বলি।

মীরা উঠে যায়। অশোক সেই মেমসাহেবটির কথা ভাবতে শুরু করে। কে ইনি? 'সব ঠিক পেয়ে যাবে'—এ কথার অর্থ কি হতে পারে। মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন একসঙ্গে এসে জমা হয়। এর পেছনের চিত্রটা দেখার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে কিন্তু আপাতত সামান্য সূত্রও খুঁজে পায় না। মীরার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ না হয়ে উপায় নেই।

—আচ্ছা মিস মেহতা, ঐ ভদ্রমহিলা কে?

মীরা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চমকে উঠল। বোধহয় সে এ ধরণের প্রশ্ন আশা করেনি। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মুখের চেহারা পাল্টে গেল। আগের চেয়ে আরো হাসি হাসি মুখ করে বলল,—উনি একজন চিত্রশিল্পী। এদেশে এসেছেন উপজাতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে রিসার্চ করতে।

—উপজাতিদের আবার শিল্পকলা আছে নাকি?

—নেই? আমারও আগে সেইরকম ধারণা ছিল।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কী করে।

মিস মেহতা চুপ করে গেল। সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে বলল—কার সঙ্গে যে কী ভাবে আলাপ হয় অত কি মনে থাকে।

অশোক বুঝল সে এ প্রশ্নের জবাব দিতে অনিচ্ছুক। আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস না করে কফির কাপে চুমুক দিতে থাকে।

মীরা কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করে। ব্যাপারটা সহজ করে নেবার জন্য ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে—একটু বসুন, আমি আসছি।

পাশের ঘরে টেলিফোনের ডায়ালের শব্দ শোনা গেল। অশোক আবার উঠে গিয়ে কান খাড়া করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। মীরা ফোন করছে—হ্যালো—ইয়েস···বলুন—হ্যাঁ,···উনি নিজেকে চিত্রশিল্পী বলে পরিচয় দেবেন···সব কথা হয়েছে···পাওয়া যাবে···না, কোন চিন্তা নেই···হতেই হবে···ছেড়ে দিচ্ছি।

আবার এ ঘরে এসে অশোকের পাশে বসে। কেমন একটু বিহ্বল দেখায় তাকে। অশোক সোজা এবার মিস মীরা মেহতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। সে দৃষ্টির মধ্যে কী ছিল জানা না থাকলেও মীরা চাতুরি দিয়ে তাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করে।

—চলি এখন।

—এ কি এখুনি উঠছেন যে ?

—একটু মার্কেট স্কোয়ারে যাব, টুকিটাকি কাজ রয়েছে।

অশোক উঠে দাঁড়াল। মীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

—গুড বাই।

—দাঁড়ান, আমিও যাব।

—আপনি ?

—হ্যাঁ।

—চলুন। মুহূর্তে অশোক ভেবে নিল মীরার সঙ্গে এখন ঘনিষ্ঠতা করা উচিত হবে কিনা।

—চলুন। মীরা অশোকের হাত ধরে।

বাইরে বেরিয়ে অশোক বলে—কোথায় যাবেন ?

—বললেন যে মার্কেট স্কোয়ারে।

—অন্য কোথাও গেলে হয় না।

মীরা অশোকের দিকে তাকায়। তার অন্তস্থল পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করে। স্মিত হেসে বলে—ওদিকে আমার একটু দরকার আছে, চলুন।

সামনেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সি করে দুজনে চলেছে। হাওয়ায় বার বার মীরার আঁচলটা এসে গায়ে পড়ছে। দুজনের কারুর মুখে কথা নেই। নিস্তব্ধতার প্রাচীর তাদের মধ্যে ব্যবধান এনে দিয়েছে না ভাবপ্রবণ করে তুলেছে বোঝা যায় না।

মিঃ রয়, আপনি এদেশে আর কতদিন আছেন?

—ঠিক বলতে পারছি না, কেন বলুন তো।

—এমনি। আবার চুপ করে যায় সে। একটু বাদেই বলে—জানেন আমি ভারতে কখনো যাইনি।

—একবার ঘুরে এলেই পারেন। নিজের দেশ দেখবেন না?

—সত্যি, দুর্ভাগ্য আমার!

—আমার সঙ্গে চলুন এবার।

—ঠিক বলছেন, মীরার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে ওঠে। শান্ত কণ্ঠে বলে—আপনি কবে যাবেন তার তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

—একদিন তো যাব বটেই।

—সে ঠিক।

ট্যাক্সি থেমে গেল। ওরা দুজনে নেমে পড়ে। বেশ লোকজন চারদিকে। য়ুরোপীয়ানরাও ঘোরাঘুরি করছে। দোকানগুলো আলোয় ঝলমল করছে। শোকেসে বিজ্ঞাপনের বাহার। নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

—আপনি কোথায় যাবেন মিস মেহতা।

—এই কাছেই, একটা ফটোর দোকানে।

—চলুন।

অশোক এখন সব সময় তার মধ্যে একটা রহস্যময়তা দেখতে পায়।

সে রহস্যকে ভেদ করার জন্য তার মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। দোকানে এসে পৌঁছয় তারা। দোকানী সহাস্যে তাদের অভ্যর্থনা করে।

—আমারগুলো হয়েছে।

—সরি মিস্, এখনো শেষ করে উঠতে পারি নি।

—উঃ আপনাদের নিয়ে আর পারা গেল না। কতদিন হয়ে গেল বলুন তো।

—সত্যি খুব দুঃখিত, তবে হয়ে এসেছে, আপনি ভেতরে এসে দেখুন আর সামান্য বাকি।

কাউন্টারের পেছনের পর্দা সরিয়ে ওরা দুজনে ঢুকে যায়। ফিসফিস আওয়াজ শুনে অশোক উন্মুখ হয়ে ওঠে। খুব নীচু গলায় কথা বলছে, স্পষ্ট বোঝা যায় না।

—বিচ্ছিন্ন হবেই। এটা মনে রাখবেন।

—আর্মসের ব্যাপারটা সত্যি।

—হ্যাঁ, বিদেশ থেকে পাওয়া যাবে। আমাদের এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে।

—সঙ্গের লোকটা কে? আমাদের কেউ?

—না, গোলা লোক। তবু হাতে রাখছি।

তারপর আরো কিছু বলে গেল। যা একদম বোঝা গেল না। পর্দা ঠেলে বাইরে আসতে আসতে বলে—আপনাদের কাজ ভাল বলেই দিই। কিন্তু প্লীজ একটু তাড়াতাড়ি করুন।

—আপনি কোন চিন্তা করবেন না মিস্। দিন কয়েকের মধ্যেই রেডি করে দেব।

—থ্যাঙ্কয়ু। চলুন মিঃ রয়।

দুজনে আবার দোকান থেকে বের হয়। নানারকম কথা ভেবেও কোন কিনারা কিছুতেই করতে পারছে না। হঠাৎ সামনে সুলোচনা বৌদিকে দেখে দুজনেই বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। বৌদি একগাল

হেসে বলে—এ ভালই করেছিস মীরা, যতই মডার্ন হইনা কেন ওসব সাহেব টাহেব দিয়ে আমাদের চলে না বাপু।

—কি বলছেন বৌদি ? মীরা বোকার মত জিজ্ঞেস করে।

—আর ন্যাকামি করতে হবে না। কচি খুকি কিছুই বোঝ না যেন !

—বৌদি। অশোক মিনতি করে।

—আঃ তুমি থাম বাপু, এতখানি বয়েস হল, জগৎ সংসার দেখে দেখে চুলে পাক ধরে গেছে।

—আপনার তো একটাও চুল পাকেনি।

—তুই চুপ কর, কিছুই জানিস না বুঝি, এই মীরা আমার কথা শোন, সামনের ঐ দোকান থেকে একটা লিপস্টিক কিনে মুখে বার কয়েক ঘষে নে, এ পোড়ার দেশে তো আর ওসব কিছু পাওয়া যাবে না।

লজ্জায় মীরার কান দুটো লাল হয়ে গেছে। মুখ নীচু করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। অশোক অন্যদিকে মুখ করে দোকানের শো কেস দেখতে আরম্ভ করে।

—নে নে মুখ তোল, আহা যতলজ্জা আমার সামনে, এদিকে তো লজ্জার মাথা খেয়ে একহাট লোকের সামনে টঙস টঙস করে দিনরাত ঘুরে বেড়াস্।

—বৌদি, রাস্তার মধ্যে কি শুরু করেছেন।

—রাস্তায় বলব না তো বলব কোথায়, তোদের পাত্তা পাওয়া যায় ! হোটেলে ছাই ভস্ম খাস তবু একটু আমার বাড়িতে গিয়ে মুখ পাল্টাতে ইচ্ছে করে না।

—একদম সময় পাই না।

—রাখ ঐ এক কথা তোদের। শোন, এটাতো হোটেলে পড়ে থাকে, বাসি পচা খেয়ে খেয়ে তো পেটের দফা শেষ করে ফেলল তুই একটু যত্ন টত্ন করিস না দিনরাত বকবকুম করেই সময় পাস না।

থাকগে, আমার এখন কাজ আছে। সামনের রোববারে দুজনে বিকেলে আমার বাড়িতে আসবি।

—যদি সময় পাই।

—ও, আমার বাসায় আসার সময় হয় না, আর সব কিছুর সময় হয়। আচ্ছা দেখব।

বৌদি চলে গেল। মীরা আর কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। কেমন বাধ বাধ ভাব তাকে বেঁধে রেখেছে। নীরবে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে। কেউ আগে কথা বলার দায়িত্ব নিতে চায় না। —আজ চলি। মীরা বলে—বাবা হয়তো এসে গেছেন।

অশোক কোন কথা বলে না। একটা ট্যাক্সি করে মিস মেহতা চলে গেল।

অশোক হোটেলে এসে ভাবনার সাগরে অপটু সাঁতারুর মত হাত পা ছুঁড়তে থাকে। অসংখ্য লোক আর অজস্র ঘটনা দ্রুত সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। হাজার সমস্যা তাদের অসহনীয় চিত্র তুলে ধরে। অশান্তি উত্তেজনা বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। দেশের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে উঠছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এত খারাপ হয়ে উঠল যে অন্যান্য আফ্রিকান দেশগুলো নাইজিরিয়ার সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। তাঁরা এ্যাফ্রো এশীয় সংহতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, অথচ আফ্রিকার একটি দেশে গৃহবিবাদ শুরু হয়েছে। দেশের একাংশের সঙ্গে অন্য অংশের মনোমালিন্য। শেষ পর্যন্ত ঘানার জেনারেল আঙ্ক্রাহ নাইজিরিয়ার নেতাদের এক সভার আয়োজন করলেন নিজের দেশে।

বেশ সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সভা আরম্ভ হল। কর্ণেল গওন ছাড়া আরো চারজন মিলিটারী গভর্ণর উপস্থিত হয়েছেন। সভার উদ্দেশ্য নাইজিরিয়ার সংকট মোচন করা। সভায় নানা বিষয়ে আলোচনা হল। দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র, নিজ নিজ এলাকায় সৈন্যবাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, রিফিউজি সমস্যা, যারা ধনসম্পদ

ফেলে গেছে তাদের কথা এবং সর্বশেষে প্রধান মিলিটারী কাউন্সিল গঠন করা।

কর্ণেল গওন অনেক কথাই স্বীকার করে নিলেন। দেশের ঐক্য স্থাপনের জন্য নতুন করে দেশ গঠনের জন্য কর্ণেল ওজুকয়ুর অনেক দাবি তিনি মেনে নিতে রাজী হলেন। কর্ণেল ওজুকয়ু শেষ দাবী তুললেন গওন সরকার অবৈধ, নতুন সুপ্রীম মিলিটারী কাউন্সিল গঠন করতে হবে, আর তার সভাপতি হবেন সরকারের প্রধান। বেশ হৃদ্যতার মধ্য দিয়ে সভা শেষ হল। স্থির হল পরবর্তী সভা আরো বিশদ আলোচ্য বিষয় নিয়ে নিজেদের দেশেই বসবে।

লোকের মন থেকে পাষাণভার নেমে গেল। সংবাদপত্রের আশা- ব্যঞ্জক খবরে সকলেই উৎসাহিত হয়ে উঠল। যে দৈত্যটা এতদিন সারা দেশ জুড়ে লেজ ঝাপটাচ্ছিল তার বুঝি এবার বিনাশ হবে।

দেশে ফিরেই কর্ণেল ওজুকয়ু আবুরি সভার কথা ফলাও করে প্রচার করতে শুরু করলেন। উত্তরাঞ্চলের যে সামান্য কিছু সৈন্যবাহিনী তখনো পূর্বাঞ্চলে ছিল, তাদের পাঠিয়ে গড়ে তুললেন এক নিরঙ্কুশ সৈন্যবাহিনী। কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার চাপ দিতে লাগলেন, গওন-সরকার তিনি মানেন না, নতুন সরকার গঠন করা হোক।

কর্ণেল গওন প্রেস কনফারেন্স ডেকে জানালেন দেশের অবস্থা। এ সময় সৈন্যবাহিনীকে বিকেন্দ্রীকরণ করলে দেশে কি ধরণের অসুবিধা হতে পারে তার চিত্র তিনি তুলে ধরলেন। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার কথা জানালেন।

এ সংবাদে কর্ণেল ওজুকয়ু আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। শরণার্থী পুনর্বাসনের কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য বন্ধ করে দিলেন। এমন কি বিদেশ থেকে অস্ত্র কেনার কথাও তিনি চিন্তা করছেন বলে জানা গেল।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণেল ওজুকয়ুর কার্যকলাপে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে

উঠলেন। দেশের ঐক্য রক্ষা করা নিতান্ত দায় হয়ে উঠছে। কোন উপায়ন্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল।

পূর্ব নাইজিরিয়ায় নানা ধরণের কার্যকলাপ দেখা গেল। কূট-নীতিক তৎপরতা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছে। আওলোও ছুটে এলেন এনুগুতে, কর্ণেলকে জানালেন পূর্বনাইজিরিয়া যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তিনি সাহায্য করবেন। হয়তো নাইজিরিয়ায় আর একটি কাতাঙ্গা সৃষ্টির উদ্দেশে কোন কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইন্ধন যোগালেন। দেশের একাংশ লোকের কাছ থেকে চাপ আসতে লাগল পূর্বনাইজিরিয়া বিচ্ছিন্ন হোক।

শেষ পর্যন্ত পূর্বনাইজিরিয়া বিয়াফ্রা নামে নতুন এক রাষ্ট্র গঠন করল।

পশ্চিমে হয়তো অনেকেই তখন মুচকি হেসে পৃথিবীর ম্যাপে আর একটি ঘুঁটি বসিয়ে দিল।

বিয়াফ্রা সৃষ্টির সাতদিনের মধ্যেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল

॥ পাঁচ ॥

সকালবেলায় দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনে অশোক অবাক হয়ে গেল। সে কল্পনাও করতে পারেনি যে এত সকালে অধ্যাপক ওদিপিয়ো তারই দারস্থ হবেন। অধ্যাপকের দিকে চেয়ে চমকে উঠল সে। সারা শরীরের ওপর দিয়ে যেন বিরাট একটা ঝড় বয়ে গেছে। ক্লান্তিতে চোখ মুখ বসে গেছে, কুঞ্চিত চুলের রাশি এলোমেলো। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় ভেতরে ঢুকেই সামনের সোফাটায় বসে পড়লেন।

—মাপ করবেন মিঃ রয়, এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য সত্যি আমি দুঃখিত।

অশোক তখনো হতভম্বের মত চেয়ে রয়েছে। বলল—এখন কোথা থেকে আসছেন আপনি ?

—সে অনেক কথা মিঃ রয়। আজকের দিনটা আপনার আশ্রয় চাইছি, সন্ধ্যের পরই চলে যাব।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী।

—যুদ্ধ লেগেছে এ খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

—হ্যাঁ। ৬ জুলাই ওগোজা শহরে নাইজিরিয়া আর বিয়াফ্রার যুদ্ধ লাগে।

—যুদ্ধের পর থেকেই আমাদের কাজ ভীষণ বেড়ে যায়। অধ্যাপক ধীরে ধীরে বলতে থাকেন।

গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই চারদিকে সাজ সাজ রব। লাগোস রেডিও থেকে ভেসে আসে, আকাশবাণী—আমরা এক, আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ নাইজিরিয়া। গওন বললেন এ যুদ্ধ কিছু নয়, বিয়াফ্রার কতটুকু শক্তি। এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করে দেব। সামান্য

পুলিশই পারবে এর মোকাবিলা করতে—এ সর্ট সারজিক্যাল পুলিশ এ্যাকশন।...

কদিনের মধ্যে পশ্চিমের শহর সুসক্কা অধিকৃত হয় কেন্দ্রীয় সৈন্য বাহিনীর হাতে। বিয়াফ্রা প্রথমে কিছুটা পেছু হটলেও কদিনের মধ্যেই সামলে নিল। নাইজিরিয়া দক্ষিণ উপকূলেও আক্রমণ করল। আগষ্ট মাসের প্রথম দিকেই বিয়াফ্রা মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধে জয়লাভ করে। একটার পর একটা শহর দখল করে নেয়। রাজধানীতে খবর আসে ওয়ারি সাপেল জয়ের পর উগেহলি আগবর, উরোমির পতন হয়েছে। কয়লাখনি অঞ্চলে দেখা দেয় তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ।

যুদ্ধের সুযোগে নানা ধরণের অবিচার শ্রমিকদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দিনের পর দিন তারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে থাকে। য়ুনিয়নের কাছে প্রত্যহ নানা ধরণের অভিযোগ আসে। কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কথায় কথায় হুমকি আর ভয় দেখানো হচ্ছে।

গোপন মিটিংয়ে এসে অধ্যাপক দেখলেন অনেকেই আগে থেকে এসে হাজির হয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে দশ বারজন নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছে। সকলেই গম্ভীর। সমস্যাজড়িত মুখগুলোর দিকে চেয়ে অধ্যাপক বলতে শুরু করেন। ধর্মঘট করা এখন সম্ভব নয়, সেক্রেটারী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে, প্রকাশ্যে আন্দোলন করা প্রায় সম্ভব হচ্ছে না, ধর্মঘট করতে গেলে যুদ্ধের অজুহাতে প্রচণ্ড অত্যাচার করবে। সাধারণ শ্রমিকেরা পেছিয়ে যাবে।

—কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে।

—সে কথা ঠিক। এছাড়া, সাম্প্রদায়িকতা ছড়াতে মালিকপক্ষ কুণ্ঠিত হবে না। বিয়াফ্রার সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার ওপর ভিত্তি করে।

—আমাদের এখানে সাম্প্রদায়িকতা নেই। ইবো আর হৌসা এখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি।

—সেটা আপনাদের কৃতিত্ব, কিন্তু তবু মালিক চেষ্টা করবে শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে।

যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেনি তারা মন দিয়ে শুনছে। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল, ভেতরে একজন শ্রমিক প্রবেশ করে বলে—কমরেড, পুলিশ আসছে, এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

দুচারজন করে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ওদিপিয়ো একজনের সঙ্গে বেরিয়ে শ্রমিক ব্যারাকের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। দূর থেকে জীপের আওয়াজ শুনে বোঝা যায় পুলিশ আসছে। দ্রুত তারা এক গলি থেকে আর এক গলিতে প্রবেশ করে। এখুনি হয়তো পুলিশ ঘরে ঘরে গিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করবে!

বড় রাস্তায় এসে পড়তেই অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। ফাঁকা রাস্তা। হঠাৎ পুলিশের গাড়ীর শব্দ হতেই তারা পেছনে তাকায়। দ্রুত গতিতে গাড়ীটা ছুটে আসছে। এবার নির্ঘাৎ গ্রেপ্তার হতে হবে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে সকলের। গাড়ীটা কাছে এসে গতি কমিয়ে দেয়, ভেতর থেকে অফিসারটি তাদের দিকে একটু তাকিয়ে জোরে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

দ্রুত হাঁটতে থাকে তারা। রাস্তার ধার দিয়ে সারি সারি কোয়ার্টার। এখানে ওখানে শ্রমিকরা জটলা করছে। তাদের হাঁটার ধরণ দেখে অনেকেই দুএকটা মন্তব্য করে। কিন্তু কোন দিকে নজর না রেখে নিজেদের আরব্ধ কাজে ব্রতী হয়ে ওঠে তারা। বিরাট এক দায়িত্ব কাঁধের ওপরে চেপে বসেছে। তারা যেখানে এসে থামল, সেটা ছোটখাট এক অফিসারের বাড়ী। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন।

—ভেতরে আসুন, বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলবেন নাকি।

—আপনি ঢুকতে না দিলে কী করে ভেতরে যাই।

হো হো করে তিনজনে হেসে উঠল।

নিরালা ঘরে কফির কাপে চুমুক দিয়ে ওদিপিয়ো চিন্তায় ডুবে যায়। শেষ রাতে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। দিনের আলোয় চলাফেরা করা তার পক্ষে বেশ মুস্কিল হয়ে উঠছে। জানালা দিয়ে এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছে। নির্মল আকাশের গায়ে তারাগুলো জ্বল জ্বল করে। দূরে, খনিতে নামার লিফট অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার ওপর দিয়ে রোপওয়ের তারগুলো একটা বিরাট সরল রেখার মত। মৃদু মৃদু হাওয়া আসছে। জানালার দিকে চেয়ে থাকতে ভারী ভাল লাগে।

অনেকদিন আগে এই খনির একটি ঘটনা এখনো তার মনে স্পষ্ট দাগ কেটে বসে রয়েছে। তখন সে কলেজের ছাত্র, কবেকার কথা ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ১৯৪৯ সাল। বুকের মধ্যে পরাধীনতার জ্বালা ধিক ধিক করে জ্বলছে। এন, সি, এন, সি পার্টি দেশময় আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তাদের দাবি স্বাধীনতা, অখণ্ড নাইজিরিয়া আর তার সংবিধান। সারা পূর্ব নাইজিরিয়া জুড়ে একটি নাম লোকের মুখে মুখে ফিরছে—নামদি অজিকিয়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই ওদিপিয়োর সঙ্গে আলাপ হল মনতুয়ের। নতুন এক পথের নিশানা সে পেল। ধীরে ধীরে এন, সি, এন, সি পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে উঠল। নিজেকে জড়িয়ে ফেলল মজদুর আন্দোলনের সঙ্গে। আর এ পথে পাথেয় হয়ে দেখা দিল মার্কস লেলিনের রচনাবলী।

ওদিপিয়ো চলে এল এনুগুর কয়লাখনি অঞ্চলে। শ্রমিকদের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। পোস্টারমারা, পথসভা, গেটমিটিং করে কোথা দিয়ে যে সময় চলে যায় নিজেই টের পায় না। দিনের পর দিন কাজ বাড়ছে। সংগঠন জোরদার হয়ে উঠছে।

ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। রুজি বাড়াতে হবে। শ্রমিকদের একতা দেখে ওদিপিয়ো অবাক হয়ে গেল। কত রকমে যে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা চলছে, তা বলে শেষ করা যায় না।

তবু ধর্মঘট হল। বিকেলে সভায় এসে সে হতবাক হয়ে গেল। এতবড় মিটিং সে আশাই করেনি। সভার শেষে মিছিল বের হল। হাতে হাতে লাল পতাকা, চোখে মুখে দৃঢ়তা, সবলতা পদক্ষেপে। বজ্রকণ্ঠে ফেটে পড়ে সব—আমাদের দাবী মানতে হবে···

যে রাস্তাটা অফিসার্স বাঙলোর দিকে গিয়েছে, সেই মোড়ে এসে মিছিল থমকে দাঁড়াল। সারি সারি পুলিশ দাড়িয়ে রয়েছে। একজন অফিসার সামনে এগিয়ে এসে সজোরে হুকুম দেয়—ডিসপার্স হাজার কণ্ঠে জবাব ওঠে—দুনিয়ার মজদুর-এক হও।···

ফট্ ফট্ ফট্···গুলি চালিয়েছে। হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাতে থাকে সবাই। কেউ কেউ নিরাপদ হওয়ার জন্য পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছে। পেছনে পুলিশ। চিৎকার, গোঙানি, কান্নায় বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। এ্যাম্বুলেন্স এসে মৃত দেহগুলো তুলে নিয়ে যায়। রাস্তার এখানে সেখানে অসংখ্য জুতো, জামার ছেঁড়া টুকরো আর চাপ চাপ জমাট বাঁধা রক্ত পড়ে রয়েছে। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে এক নারকীয় বীভৎসতা!

পরদিন থেকে হরতাল ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন শহরে। চতুর্দিকে দাবি উঠল, ইংরেজ সরকার—নাইজিরিয়া ছাড়।

ইংরেজ সরকারের দমন নীতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ওদিপিয়ো।

আজ আবার শ্রমিকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এর পরিণতি কী হবে কে জানে!

নির্জন রাস্তা দিয়ে একজন লোক এগিয়ে এসে জানালার দিকে মুখ তুলে চাইতেই অধ্যাপকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। অধ্যাপক তাকে দাঁড়াতে বলে দরজা খুলে দিলেন। লোকটি রাস্তার এদিক ওদিক চেয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

—কমরেড সময় নেই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন্। জন কয়েক কাল গ্রেপ্তার হয়েছে। কর্ণেল ওজুকুয়ু এবং মার্কিন ভাইস কনসালের মধ্যে কয়েকবার মিটিং হয়েছে।

—হুঁ অবস্থা ক্রমশঃ ঘোরাল হয়ে উঠছে। খুব শীগগীর আমাদের ওপর বড় রকমের আক্রমণ হতে পারে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

গৃহস্বামী নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। অধ্যাপকের দিকে শ্রদ্ধাজড়িত চোখে চেয়ে বললেন আপনার জন্য কিছুই করতে পারলুম না।

—ধন্যবাদ, যথেষ্ট করেছেন, এটুকুই বা কজনে করে।

—না, না, ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

—তবু আপনার কথা মনে থাকবে এখন চলি।

দুজনে রাস্তায় নেমে এল। কিছুদূর বিভিন্ন গলির মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে একটা একটা লরির সামনে এসে তারা থামল। ভোর রাত্রে এনুগু রওনা হয়ে যাবে কয়লা ভর্তি গাড়িটা। ড্রাইভারের পাশে বসে মাথার টুপিটা আরো একটু নামিয়ে দিলেন অধ্যাপক ওদিপিয়ো। হুঁহুঁ করে গাড়ী ছুটে চলেছে।...

—তারপর কোথায় যাব কিছুই ঠিক করতে না পেরে যখন মনে মনে পথ হাতড়াচ্ছি, হঠাৎ আপনার কথা মনে এল। চলে এলাম। যা হয় হবে। অধ্যাপক হেসে হেসে বললেন।

—আপনার যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে। বিশ্রাম করুণ এখন, পরে দেখা যাবে।

—বিশ্রামের সময় নেই মিঃ রয়, তবে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাধ্য হয়েই আপনার অতিথি হয়ে থাকতে হবে।

—তারপর ?

—হয়তো একটা ব্যবস্থা হবে, কেউ না কেউ আসবে।

—আপনি হাতমুখ ধুয়ে নিন, যদি ইচ্ছে হয় স্নানও করে নিতে পারেন।

সেই ভাল। অধ্যাপক বাথ রুমে ঢুকে গেলেন। অশোক চুপচাপ বসে বসে সিগারেট টানতে সুরু করে। সব দেশেই একই অবস্থা। নাইজিরিয়া পৃথিবী ছাড়া নয়। অবাধে যা খুশী করার অধিকার এতকাল যারা ভোগ করে এসেছে, সে অধিকারে এতটুকু বাধা দিলে তারা ভয়ংকর চটে যায়। নিজেদের ভোগ দখল থেকে ছিটে-ফোটাও ছাড়তে রাজি নয়।

সন্ধ্যের পর অধ্যাপককে বেশ তাজা দেখায়। সারাদিনের বিশ্রামের পর অবসাদ দূর হয়েছে। চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অশোকের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

—আপনার যাবার সময় হল।

—হ্যাঁ। যাবার পথে পাথেয় করে নিয়ে যাব একজন ভারতীয়ের ভালবাসা পূর্ণ বন্ধুত্ব।

—আপনাকে বড্ড অন্যমনস্ক দেখছি, খুব চিন্তিত নাকি। অশোক কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে।

—না বাইরে পায়ের শব্দ শুনেছি। আমি বাথরুমে গেলাম। জানিনা কী হবে!

দরজায় পরপর দুবার শব্দ হল। একটু সময় নিয়ে অশোক দরজা খুলে দিতেই একটি মেয়ে ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে তার চোখ দুটো কেমন করুণ হয়ে উঠে। এক নিদারুণ হতাশার কালিমা সারা মুখ ছেয়ে রয়েছে। ছোট টেবিলটার ওপরে দুটি কাপ দেখে ঠোঁটদুটি ঈষৎ ফাঁক হয়ে হাসির একটা রেখা ফুটে উঠল। মেয়েটিকে বড্ড চেনা চেনা লাগছে অশোকের। কোথায় যেন দেখেছে অথচ ঠিক মনে করতে পারছে না। ও, হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে। সেদিন রাতে এই মেয়েটিকেই বলতে গেলে উদ্ধার করেছিল সে।

দরজা খোলার শব্দ হয়। অধ্যাপক বেরিয়ে আসতেই ডোরার সমগ্র মুখমণ্ডল উজ্জলতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল—কেমন আছ? কোন অসুবিধে হয়নি তো।

—না, তোমার খবর কি?

—ভাল। কোথায় যাব এখন?

—তা জানিনা সাউথ স্কোয়ারে তোমাকে পৌছে দিতে হবে, তারপর সেখান থেকে কোথায় যাবে জানি না।

—আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি বেয়ারাটার খোঁজ করছি।

—অকারণ ব্যস্ত হবেন না মিঃ রয়। আমাদের এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে।

—আচ্ছা, এখুনি আসছি। অশোক বেরিয়ে গেল।

—তোমার আণ্ডার গ্রাউণ্ড জীবন সুরু হয়ে গেল।

—হ্যাঁ। তবে নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, যোগাযোগ থাকবে।

—কবে দেখা হবে জানি না। আর দেখা হবে কি না তাও জানি না।

—অবুঝ হয়ো না ডোরা। নিজের হাতের মধ্যে ডোরার একটা হাত নিয়ে অধ্যাপক বলে।

ডোরা মাথা নীচু করে চুপ করে থাকে। তার দুচোখ জলে ভরে গেছে। নিজের হাতের ওপরে এক ফোঁটা উষ্ণ জল পড়তেই অধ্যাপক চমকে উঠল।—একি, তুমি এত সেন্টিমেন্টাল।

—কৈ না তো। জলভরা চোখদুটো তুলে হাসতে হাসতে ডোরা বলে।

তার মুখ দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অধ্যাপক বলে—কিছু ভেব না, তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঠিকই থাকবে। আণ্ডার গ্রাউণ্ড মানে চুপচাপ লুকিয়ে থাকা নয়, তাহলে পার্টির কাজ হবে কী করে।

—মিঃ রয় আসছেন না তো এখনো। ডোরা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে।

অশোক এসে ঘরে ঢোকে। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে অধ্যাপকের দিকে এগিয়ে দেয়।

—আপনাকে কিন্তু কিছুই দিতে পারলুম না।

—ছোট বোনকে অনেক আগেই ভালবাসা দিয়েছেন মিঃ রয়।

—চল।—হ্যাঁ। গুডবাই মিঃ রয়।

দুজনে বেরিয়ে গেল। তাদের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ে অশোকের। আজ সারাদিন ঘর থেকে বের হয়নি। বাইরের কোন খবর জানে না। দুপুরে রেডিয়ো শোনার সময় হয়নি। এখন একবার বের হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে রয়টারের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা হওয়া নিতান্তই দরকার।

ঘর থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জে এসে দেখল পুলিশ হোটেল ঘিরে ফেলেছে। একজন রাজনৈতিক কর্মী হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ঘরে ঘরে খোঁজ করা হচ্ছে। অশোকের ঘরে এসেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করল। এমন কি একথাও জানাল যে তাদের খবর এ ঘরেই সে লোকটি আশ্রয় নিয়েছে। অনেক খোঁজা-খুজি করেও কিছু পাওয়া গেল না।

অশোকের মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। আর একটু আগে এলেই অধ্যাপক নিশ্চিত গ্রেপ্তার হতেন।

রাস্তায় বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ীর সম্মুখে ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সৈনিক নিয়োগ কেন্দ্র। অনেক লোক 'কিউ' দিয়ে রয়েছে। যুদ্ধ এদের মধ্যে উন্মাদনা এনে দিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এতটুকু বিরক্তি নেই, অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ নেই, শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ।

প্রেস ক্লাবে এসে দেখে হৈ হৈ কাণ্ড। বিভিন্ন কাগজের প্রতি-নিধিরা চুটিয়ে আড্ডার সঙ্গে চুটকি দিয়ে ক্লান্ত মনকে হাল্কা করার চেষ্টা করছে।

মিঃ আকুয়া পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বলল। একটা টেবিল ঘিরে পাঁচ ছজন গোল হয়ে বসেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে মাথার ওপরকার জায়গাটুকু। একজন বয়স্ক সাংবাদিক টেবিলে সজোরে ঘুষি মেরে বলল—মার্কিন সরকার কিছুতেই এর'মধ্যে নাক গলাবেন না।

—দাদার কাছে প্রেসিডেন্ট বুঝি খবর পাঠিয়েছে।

কোন উত্তর নেই। সবাই অধীর আগ্রহে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা হল—সামনে নির্বাচন, হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে।

—ঠিক, দাদার কথাই ঠিক। আর একজন সমর্থন জানায়।

—কিন্তু বিয়াফ্রা যদি মার্কিন সরকারের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়, তখন ?

—হায় হায় কি মার্কিন মহিমা। একজন চুকচুক করে দুঃখ প্রকাশ করে।

—বেশ, গরিবের কথা বাসি হলে সত্যি হয়, তখন আমার কথাটা একটু মনে রেখ দয়া করে। খবরের কাগজের লোক একদিনেই সব ভুলে যায়, মনে রাখা কষ্ট।

—চলুন, এসব রসালাপ শুনে আর লাভ নেই। কাজ যা ছিল তা তো কিছুই হল না।

দুজনে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা রেঁস্তরায় বসে। বেশ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। অনেকেই ফিসফাস করে যুদ্ধের কথা আলোচনা করছে।

—আপনার কি মনে হয় মিঃ আকুয়া, যুদ্ধ তাড়াতাড়ি মিটবে ?

—না।

—অনুমানের ভিত্তি ?

—অনুমানের কোন ভিত্তি নেই, অনুমান অনুমান-ই।

—উঃ আপনিও প্রেস কনফারেন্স শুরু করেছেন ?

অশোকের কথায় দুজনেই হেসে ওঠে।

—এখানকার য়ুরোপীয় সমাজ কী বলে, তাদের তেলের ব্যবসা সম্বন্ধে মাথা ব্যথা নেই ?

—নিশ্চয়ই আছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনো পাইনি। দেশের অর্থনীতি এখনো ইংরেজরা নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য ইদানীং মার্কিন পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

—তবে এ যুদ্ধে তাদের স্বার্থের হানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

—প্রথম প্রথম তারা এমন ভাব দেখাল যেন এযুদ্ধে তাদের কোন আসে যায় না, প্রয়োজন হলে দুটো কোম্পানী করবে, একটা নাইজিরিয়ায় আর একটা বিয়াফ্রায়।

—কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নাইজিরিয়াকে সমর্থন করছে, সুতরাং এখানকার ইংরেজ অধিবাসীরা নিজ সরকারকে সমর্থন করবে না ?

—তবে তো বিয়াফ্রা সরকারের উচিত সমস্ত ইংরেজদের শত্রুপক্ষের লোক বলে গ্রেপ্তার করা। কিন্তু সে তো হচ্ছেই না বরং বিয়াফ্রাও ইংরেজদের তোয়াজ করার চেস্টা করছে।

—কী রকম ?

—সে এক ইতিহাস। আকুয়া চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতা উল্টোতে শুরু করে।

পশ্চিম আফ্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজ ব্যবসা করছে। তাদের ব্যবসার স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একটি শক্তিশালী সমিতি রয়েছে। সে সমিতির নাম ওয়েস্ট আফ্রিকা কমিটি, প্রধান কার্যালয় লণ্ডনে। ব্রিটিশ সরকারের ওপরে এই কমিটি যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিয়াফ্রার প্রতিনিধি হয়ে লণ্ডনে

গেলেন স্যর লুই মবেনটো এবং অধ্যাপক এ'ননজকু। রয়েল হোটেলের একটি কামরায় তখন তাঁরা উদ্বেগমুহূর্ত কাটাচ্ছেন।

দুজনে এসে দেখা করলেন সভাপতির সঙ্গে। বর্তমান যুদ্ধের অবস্থা বিশদ ভাবে বর্ণনা করে জানালেন ভবিষ্যৎ কী হতে পারে। তাঁদের প্রধান অভিযোগ ইংরেজ সরকার সরাসরি নাইজিরিয়াকে সাহায্য না করে যদি নিরপেক্ষ থাকে তবে যুদ্ধ পরিস্থিতি অন্যরকম দাঁড়াবে। ব্রিটিশ কোম্পানীর স্বার্থের কথা চিন্তা করে সভাপতি জানালেন তিনি সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।

কমনওয়েলথ অফিসে বিয়াফ্রার ব্যাপার নিয়ে বেশ হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের গতি দেখে অনেকেই শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। গওনের কথায় সকলেরই ধারণা ছিল হয়তো অল্প কদিনের মধ্যেই যুদ্ধ মিটে যাবে। কিন্তু শেষ হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং বিয়াফ্রা যুদ্ধে জয়লাভ করছে। এ অবস্থায় যদি তৈলাগারগুলোর উপরে বোমা পড়ে তবে অবস্থা একেবারে অন্যরকম দাঁড়াবে। সরকার ওয়েস্ট আফ্রিকা কমিটির কথা মনযোগ দিয়ে শুনল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল ব্রিটিশ হাই কমিশনারের রিপোর্ট না পেয়ে কিছু করা যাবে না।

এদিকে স্যর লুই বোঁ বোঁ করে গোটা লণ্ডন সহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বড় বড় সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তিনি দেখা করে বিয়াফ্রার ব্যাপারটা তুলে ধরছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্যর লুইকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। বিয়াফ্রার মনোভাবে ইংরেজ সরকার নাকি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারে নি। নাইজিরিয়ার সঙ্গে তাঁদের চুক্তি বহাল রয়েছে। এ অবস্থায় কিছু করা সম্ভব নয়।

—কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া স্থানীয় ইংরেজদের মধ্যে দেখা দেবে না।

—নিশ্চয়ই, এখানে এক নতুন প্রচার জোরদার হয়ে উঠল। হঠাৎ গুজব শোনা গেল বিয়াফ্রার অগ্রগতিতে গওন দেশ ছেড়ে

পালানোর ব্যবস্থা করেছেন, এমন কি তাঁর প্লেন পর্যন্ত প্রস্তুত। কিন্তু ব্রিটিশ হাইকমিশনারের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি পরিকল্পনা ত্যাগ করে আবার যুদ্ধ চালাতে মনস্থির করেছেন।

—অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত, বিয়াফ্রার জয়লাভ হত, ব্রিটিশ হাইকমিশনারের জন্য হল না।

—এই তো অর্থ দাঁড়ায়।

—তবে তো তাদের রাগারই কথা। যুদ্ধের অসুবিধেয় তাদেরও ভুগতে হচ্ছে। আচ্ছা, বিয়াফ্রা এত অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে কোথা থেকে বলতে পারেন ?

আকুয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে একটু হাসে। কোন কথা না বলে চোখের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। তারপর ধীরে ধীরে বলে—কর্ণেল ওজুকয়ুকে জিজ্ঞেস করুন। আজকে তিনি একটা মিটিং ডেকেছেন, যাবেন নাকি ?

—কখন ?

—এই তো একটু বাদেই। উঠুন।

বেশ ভিড় হয়েছে, প্রচুর লোকজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সমাজের সব ধরণের মানুষের এক সমাবেশ। ইবো ছাড়াও অন্যান্য সংখ্যালঘু উপজাতিও রয়েছে। একদিকে যেমন রয়েছে চেম্বার অফ্ কমার্সের হোমড়া চোমড়া, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী অপর দিকে রয়েছে খৃষ্টান পাদ্রী, সৈন্যবাহিনীর অফিসার উপজাতি-সর্দার। অনেকেই বিষণ্ণ মনে চুপ করে রয়েছেন। হয়তো ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিব্রত। আবার কেউ বেশ উচ্ছলতা প্রকাশ করছেন, রঙ চড়িয়ে যুদ্ধের গল্পও বলছেন।

কর্ণেল্ ওজুক্য়ু সভায় প্রবেশ করলেন। কোনরকম ভূমিকা না করেই বলতে আরম্ভ করেন—আপনারা নিশ্চয়ই যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করেছেন। কর্ণেল গওনের দম্ভোক্তি এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করে দেব। পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের সৈন্যবাহিনী বীর বিক্রমে এগিয়ে

চলেছে। স্বাভাবতই আপনাদের মনে হতে পারে যে ইবোরা পশ্চিমে ইউরোবা এবং অন্যান্যদের ওপর অত্যাচার করবে, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা মানুষের ওপর অত্যাচার করে দেশকে শশ্মানে পরিণত করতে চাই না। পরস্পরের ভালবাসা নিয়ে আমরা একসঙ্গে বাঁচতে চাই। আমাদের এ অগ্রগতি লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই পশ্চিমাঞ্চল গওনের ওপর চাপ দিয়ে আপোস মীমাংসার দাবি তুলবে। অল্প কদিনের মধ্যেই আমরা তীব্রভাবে আক্রমণ শুরু করব।

কর্ণেল ওজুক্‌য়ু তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল। বিয়াফ্রা হাউসের লনে এক একটা টেবিল ঘিরে চার পাঁচজন বসেছে। বেয়ারারা ঘুরে ঘুরে কফি স্ন্যাক দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একজন ইউরোবা উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে যুদ্ধ যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল, আমরা যুদ্ধ চাই না।

কর্ণেল স্মিত হাসি হেসে বলেন—যুদ্ধ আমরাও চাই না, গওন সরকার বিদেশী শক্তিতে পুষ্ট তাঁর দম্ভ অত্যন্ত বেশী কিন্তু অল্প কদিনের মধ্যেই তাঁকে মীমাংসায় আসতে হবে। আপনাদের শুধু জানাতে চাই হৌসাদের মত আমরা দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করব না। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারেন।

সভা শেষ হয়ে গেল। লোকজন নানারকম মন্তব্য করতে করতে বেরিয়ে আসে। উপজাতীয় সর্দাররা একদম মুখ খোলেনি। মনে হয় তারা এখানে আসতে পেরেছে এই যথেষ্ট। অনেকেই শুধু অবস্থার পর্যবেক্ষণ করে গেছে, মুখ দিয়ে একটা শব্দও করেনি।

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আকুয়া জিজ্ঞেস করে—কি বুঝলেন?—যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলবে। নাইজিরিয়া সরকার বিয়াফ্রাকে তুচ্ছ মনে করেছিল, সে ধারণা ভুল।

—আমারও তাই মনে হয়। কর্ণেল ওজুক্‌য়ুকে দেখে অত্যন্ত খুশি মনে হল। এ হর্ষের পেছনে নিশ্চয় এমন কোন আশ্বাস আছে যার বলে তিনি বলীয়ান।

হঠাৎ ভোঁ করে সাইরেন বেজে উঠল। লোকজন দৌড়তে সুরু করেছে। দোকানপাট ঝপঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ীগুলো যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। আকুয়া অশোককে টানতে টানতে একটা ট্রেঞ্চে নিয়ে গেল। রাস্তাঘাট কয়েক মিনিটের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে।

অসহ্য গরম লাগতে থাকে ট্রেঞ্চের মধ্যে। এই ছোট্ট গর্তটার মধ্যে এতগুলো লোক গাদাগাদি করে বসে রয়েছে। একজনের নিঃশ্বাস আর একজনের মুখের ওপরে এসে পড়ছে, বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কোন উপায় নেই। ফিস ফিস করে কারা যেন কথা বলছে। পাশের লোকের কনুই অশোকের পাঁজরায় এমনভাবে ঠেকে রয়েছে যে ব্যথা লাগছে, বারকয়েক সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি। ওপাশ থেকে একটা বাচ্চা ছেলের কান্নার শব্দ ভেসে আসে। তার মা বারবার নিষ্ফলভাবে ভোলাবার চেষ্টা করছেন। দূর আকাশ থেকে প্লেনের অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে।

এবার শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়, অনেক নীচে নেমে এসেছে। লোকগুলো ভয়ে মাথা নীচু করে। একদল ভেড়ার মত নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুতি করে থাকতে থাকতে ঘেমে গেছে সবাই। কেমন বিশ্রী একটা অনুভূতি বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

কট্ কট্ কট্।

দূর থেকে ভেসে আসে এ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফ্টের শব্দ। উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে সবাই বোমার আওয়াজ শোনার জন্য। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও বোমাপড়ার কোন শব্দ শোনা যায় না। প্লেনের শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। আরো কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে তারা।

অলক্লিয়ারের শব্দ হতেই লাফিয়ে ওঠে সবাই।

॥ ছয় ॥

ভিক্টর ব্যাঞ্জো। বিয়াফ্রায় একটি সাড়া জাগানো নাম। মেজর ভিক্টর ব্যাঞ্জোর হাতে মধ্যে পশ্চিম রণাঙ্গনে একটি পর একটি সহরের পতন হয়েছে। বিয়াফ্রার সৈন্যবাহিনী মেজরের নেতৃত্বে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এমন কি নাইজিরিয়া সৈন্যবাহিনীর দুদ্ধর্ষ সেনাপতি কর্ণেল মুর্তেলা মহম্মদ পশ্চিমাঞ্চল আক্রমনের পূর্বে মেজরের নাম শুনে থমকে দাঁড়িয়ে তিনবার চিন্তা করেছেন। হঠাৎ ভিক্টরকে রণাঙ্গন থেকে ডেকে পাঠান হল।

ভিক্টর স্টেট হাউসে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু প্রবেশ পথেই তাকে প্রহরী বাধা দিল। সঙ্গের সশস্ত্র দেহরক্ষীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ভিক্টর রেগে উঠলেন।

—জানো কাকে বাধা দিচ্ছ, পথ ছাড়।

—জানি স্যর, কিন্তু হুকুম নেই, আমরা কিছু করতে পারব না।

—মানে, আমি বলছি পথ ছেড়ে দাঁড়াও তোমরা।

—হুকুম নেই হুজুর, মাফ করবেন।

—কর্ণেলকে এখুনি খবর দাও, আমি আসছি।

দূর থেকে মেজরকে দেখে একজন অফিসার ছুটে এল।

—আসুন স্যর, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?

—আমার কথা নয়, আমার দেহরক্ষীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না কেন? ব্যাপার কি?

—আমি তো সঠিক জানিনা স্যর, এখুনি খোঁজ করছি।

অফিসারটি দৌড়ে ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই ফিরে এসে অনুনয় করে বলল, স্যর আপনার দেহরক্ষীরা এখানেই থাকুক।

—কেন? মেজর চটে ওঠেন।

—স্যর স্টেট হাউসে কর্তব্যরত সৈন্যছাড়া অন্য কোন সৈন্য সাধারণতঃ প্রবেশ করে না। আপনার দেহরক্ষীকে অবশ্য প্রবেশ করতে দিতে কোন বাধা নেই, তবে এদেরকে ঢুকতে দিলে অন্য মেজরও এই সুযোগ চাইবে।

—তা বটে, একটা নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা ভাল।

—তাই বলেছিলুম স্যার ওরা এখানে থাকুক। আর কাছেই তো ওরা রইল, ডাকলেই শুনতে পাবে।

কথাটা ভিক্টরের খারাপ লাগল না। যদিও সে জানে না কেন কর্ণেল ডেকেছে তবু মনে হল কাছেই তো রয়েছে। কী আর হবে।

—বেশ চলুন। রিভলভারটা একবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিল।

দুজনে হেঁটে চলেছে। লাল কাঁকরের পথ। খস্ খস্ শব্দ হতে থাকে। পথের দুপাশে অসংখ্য মরশুমী ফুল ফুটে রয়েছে। ফুলের ওপরে ভ্রমরের গুঞ্জন মুহূর্তের জন্য ভারী বুটের শব্দে স্তব্ধ হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে খট্‌খট্ করে উঠতে থাকে তারা। পাশের অপেক্ষা করার ঘরে মেজরকে নিয়ে এসে অফিসারটি বলে—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন স্যর, আমি কর্ণেলের কাছে খবর পাঠাচ্ছি।

ভিক্টর সোফায় বসে গা এলিয়ে দেয়। চোখের সম্মুখে কর্ণেল ংজুকয়ুর একটা বড় ফটোগ্রাফ ঝুলছে। অন্য দেওয়ালে নাইজিরিয়ার একটা ম্যাপ। তার পাশেই রয়েছে বিয়াফ্রার ম্যাপ। নাইজিরিয়ার ম্যাপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত কথাই না মনে পড়ে। পশ্চিমাঞ্চলের ইউরোবা সে। প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের সময় জেনারেল আইরনসির হাতে বন্দী হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু তাকে রাখা হয়েছিল পূর্বাঞ্চলের কারাগারে। দ্বিতীয়বার সামরিক অভ্যুত্থানের পর কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বিয়াফ্রার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। তারপর অপ্রতিহত গতিতে একের পর এক যুদ্ধে জয়মাল্য লাভ করতে থাকেন। অবশ্য কর্ণেল ইফিয়াজুয়ানা এবং মেজর ফিলিপ আলালের সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে কোন যুদ্ধেই জয়লাভ করা সম্ভব হত না।

প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের পর কর্ণেল ইফিয়াজুয়ানা ঘানায় পালিয়ে যান, তারপর দেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হতে হয়। মেজর ভিক্টরের মত সেও পরে মুক্তিলাভ করে।

মেজর ফিলিপ এক আদর্শবাদী যুবক। চোখে তার অসাধারণ স্বপ্ন। মস্কো থেকে সাম্যবাদের শিক্ষা নিয়ে দেশে এসে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। দেশকে নতুন করে সাজানোর স্বপ্ন দেখেন।

এ ছাড়াও কত অফিসার আর সাধারণ সৈনিক মেজরের কথায় ওঠে বসে। তাদের কর্তব্যের কথা চিন্তা করে মেজরের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। বাইরের দিকে চেয়ে দেখেন দেহরক্ষীরা ঠিক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রধান ফটকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মেজর ফিরে না যাবে ততক্ষণ তারা ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, একচুল নড়চড় নেই।

স্টেট হাউস থেকে একজন সৈনিক নিঃশব্দে বেরিয়ে প্রধান ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিক্টরের দেহরক্ষীরা তার দিকে ফিরে চাইল। সে ধীরে ধীরে তাদের কাছে এসে বলল—আপনারা মেজরের সঙ্গে এসেছেন।

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো।

—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি, আপনারা দেশের নমস্য, কত যুদ্ধ জয় করেছেন, দেশের লোক আপনাদের কথা বলে।

—কী বলে, তারা কি আমাদের নাম জানে? একজন উৎসাহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে।

—আমরা তো রাজধানীতে বসে হৈ হৈ করি, আসল কাজ আপনারা করছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছেন। আচ্ছা লড়াইয়ের সময় খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়, না?

—হুঁশিয়ার মানে, যে কোন সময় প্রাণ চলে যেতে পারে, নেহাৎ আমরা বলে টিকে রয়েছি, অন্য কেউ হলে এতদিনে কোথায় যে চলে যেত তার ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধ তো দেখেন নি বুঝবেন কী।

—সে ঠিক।

সৈনিকটি পকেট থেকে পানীয়ের বোতল বের করে নিজের গলায় একটু ঢেলে পাশে রেখে ঘাসের ওপরে বসে। দেহরক্ষীরা তার বোতলের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। একজন ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে পাশে ঝুপ করে বসে পড়ে। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে —বুঝলেন বুম বুম করে বোমা পড়ছে, তার মধ্যে বুকে হেঁটে চলেছি, উঃ—সেসব দিনের কথা মনে হলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।

—সে তো বটেই।

—তবে বুঝুন। দেহরক্ষীটি এবার আর কোন কথা না বলে নিজের বোতল থেকে কিছুটা ঢেলে দেয়। —বাঃ পানীয়টি তো বেশ।

—খাঁটি বিলিতি জিনিষ। অনেক কষ্টে এক আমেরিকান সাহেবের কাছ থেকে আদায় করেছি। নিন না, আর একটু নিন।

দেহরক্ষীটি আবার খানিকটা নিজের গলায় ঢেলে দেয়। অন্যান্য দেহরক্ষীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে একে একে সবাই বসে পড়ে। সৈনিকটি আর একটি বোতল বের করে। তারপর দুটো বোতল পালা করে সকলের হাতে হাতে ফিরতে থাকে।

—না, সত্যি জিনিষটা খাঁটি, বেশ আছেন আপনারা!

—যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ জিনিষও জোটে না। কবে রেশন আসবে, তার অপেক্ষায় হাঁ করে বসে থাক। একটু যে গলাটা ভিজিয়ে নেব তারও উপায় থাকে না। বাঃ বেশ জিনিষ!

—একি তুই শেষ করবি নাকি, আমার জন্য রাখ একটু।

—দাঁড়া, কাজের সময় কথা বললে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আবার।

—তাই বলে তুই সব শেষ করবি।

—শেষ আবার কোথায় করলাম, নে। পাশের এক জনকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলে।

—ধুৎ, কী আছে এতে, সব তো শেষ করেছিস।

সৈনিকটি দেহরক্ষীদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। মদ খাওয়ার

স্পৃহা দেখে সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। এবার হয়তো কার্যসিদ্ধি হতে পারে। নিরীহ গলায় বলে—আপনারা কি আর একটু চান ?

—আছে নাকি আর ? একজন উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—সঙ্গে নেই তবে ব্যবস্থা করতে পারি। অবশ্য যদি আপনারা অনুমতি করেন।

—এ আর বলতে, জলদি করুন।

—তবে দয়া করে একটু আমার সঙ্গে আসুন, এই কাছেই বিশেষ সময় লাগবে না।

—চলুন। একজন উঠে দাঁড়ায়।

—এই যাচ্ছিস যে, মেজর সাহেব যদি ডাকে।

—না, না, মেজর সাহেব এখন কাজে ব্যস্ত, তাঁর আসতে দেরী হবে। ততক্ষণে আপনারা ফিরে আসতে পারবেন। সৈনিকটি তাদের লোভাতুর করে তুলতে সাহায্য করে।

তবুও তাদের আসতে ইতস্ততঃ করা দেখে বলে—এই প্রহরীকে বলে যাচ্ছি, মেজর সাহেব যদি ডাকেন তবে যেন খবর দেয়।

—চল একটা দিন না হয় একটু স্ফূর্তি করি।

সৈনিকটির সঙ্গে তারা চলে গেল। এদিকে স্টেট হাউস থেকে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হয়েছে। প্রধান ফটক ছেড়ে সৈনিকটির সঙ্গে তাদের চলে যাওয়ার খবর দেওয়া হয়।

দুজন সৈনিক রাইফেল উঁচিয়ে যে ঘরে ভিক্টর বসেছিল সেখানে প্রবেশ করে।

—হ্যাণ্ডস্ আপ।

চমকে ওঠে ভিক্টর। সম্মুখে দুজন সৈনিককে ঐ অবস্থায় দেখে সে অবাক হয়ে যায়। কোন উপায় না দেখে হাতদুটো মাথার ওপরে তুলে ধরে। একজন এগিয়ে এসে তাকে নিরস্ত্র করে, অন্যজন তখনো রাইফেল উঁচিয়ে রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে তাকে বন্দী করা হয়।

একজন সৈনিক সামনে, অন্যজন পেছনে, মাঝখানে ভিক্টর।

কয়েক মুহূর্ত আগেও সে ছিল মেজর, বিয়াফ্রা সৈন্যবাহিনীর একজন বীর যোদ্ধা, বিয়াফ্রার গলায় সঞ্চিত করেছে সে অনেক জয়মাল্য, আর এখন সে বন্দী, সাধারণ নাগরিকের চেয়েও অধম।

খট্ খট্ খট্। তিনজোড়া বুটের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। অলিন্দ থেকে ঘরে, ঘর থেকে বারান্দায়, আবার ঘরে। বারকয়েক এমনি করে ঘোরার পর মেজরকে যে ঘরে নিয়ে আসা হল সেখানে কর্ণেল ওজুকয়ু বসে রয়েছেন, পাশে চিফ অফ দি আর্মি স্টাফ এবং অন্যান্যরা। কর্ণেল গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছেন। একদৃষ্টে তিনি চেয়ে আছেন মেজরের দিকে, কারুর মুখে কোন কথা নেই। একটা গুমোট আবহাওয়া অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

—এরকম করার অর্থ কি? মেজর সরাসরি প্রশ্ন করেন।

—এর জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু কোন উপায় ছিলনা। কর্ণেল ভাবলেশ হীন কণ্ঠে উত্তর দেন।

—এতদিন আমি যে কাজ করে এসেছি তার কোন মূল্য নেই? গ্রেপ্তারের কারণ কি আমাকে জানানো হবে?

—যথা সময়ে জানতে পারবেন, অনাবশ্যক উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই।

—এই কদিনে বিয়াফ্রা যেসব যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, তার রেকর্ড নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে, সেসব যুদ্ধে আমার এবং আমার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর কর্মকুশলতার পরিচয় নিশ্চয়ই আপনার জানা।

—সত্যি আমি দুঃখিত মিঃ ব্যাঞ্জো। আপনার বক্তব্য যথা সময়ে পেশ করবেন। এখন আমার করার কিছু নেই। আপনি বিশ্রাম করুন।

সৈনিকের মেজর ব্যাঞ্জোকে নিয়ে গেল। কর্ণেল ওজুকয়ু তার দিকে চেয়ে রয়েছেন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মেজরকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। জেল থেকে মুক্ত করে বিয়াফ্রা সৈন্যবাহিনীতে স্থান দিতে এতটুকু সংশয় তার মনে দেখা দেয়নি।

সেদিনের ঘটনা এখনো মনে করলে অজানা শিহরণ বয়ে যায় শরীরের মধ্য দিয়ে।

লেফটনান্ট কর্ণেল দেখা করে জানালেন নাইজিরিয়ান সৈন্য বেনিন সিটি ঘিরে ফেলেছে অথচ মেজর ব্যাঙ্গো তার সৈন্যদের যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। সাপেল, আউচি, ইওয়েবেন সর্বত্র কোন রকম যুদ্ধের আয়োজন রাখা হয়নি। মেজর সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

চমকে ওঠলেন কর্ণেল ওজুকয়ু। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। অনেক কষ্টে তিনি সাধের বিয়াফ্রা সৃষ্টি করেছেন। যেদিন থেকে মেজর আইরনসিকে নিহত করা হয়, সেদিন থেকেই তিনি সংকল্প করেন, গোটা নাইজিরিয়ায় আবার ইবো প্রাধান্য বিস্তার করতে হবে। নতুন এক ইবো সাম্রাজ্য সৃষ্টি করতে হবে। বিয়াফ্রার সৃষ্টি হয়েছে বড় জটিল, সর্পিল পথে। তার পথে পথে ছড়ানো রয়েছে কুটিলতা, জটিলতা, বৈরীতা। সেই বিষবৃক্ষ কি তবে ফল দিতে শুরু করছে? নতুন করে আবার ষড়যন্ত্র দানা বাঁধতে শুরু করেছে?

অস্থির হয়ে ওঠেন কর্ণেল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন—ফিলিপ কি কম্যুনিস্ট?

—কিছুদিন মস্কোয় ছিল।

—হুঁ। কর্ণেল চুপ করে থাকেন। তারপরে বলেন—ভিক্টরের সঙ্গে ওর কি গোপন বৈঠক হয়েছে। হয়তো বিদেশীদের সঙ্গেও যোগাযোগ থাকতে পারে। আপনি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান?

—আপনি যে রকম আদেশ করবেন। তবে রাষ্ট্রের নিরপত্তার কথা ছাড়া আমি অন্য কোন কথা চিন্তা করি না। আমার মনে হয় ওদের ডেকে পাঠান ভাল।

—সেই ভাল। এখুনি তার ব্যবস্থা করুন।

কর্ণেল ডুব দিলেন মন সাগরে। অসম্ভব, কম্যুনিস্টদের কোন ক্ষমা নেই। এমনিতে নাইজিরিয়া কমনিস্টদের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়ে

দেশের অনেকটা সর্বনাশ সাধন করেছে। বিয়াফ্রা সে ভুল পথে কোন প্রকারেই অগ্রসর হবে না।

আরো খবর পাওয়া গেল। ভিক্টর আওলোও-এর সঙ্গেও নাকি দেখা করেছে। তাঁকে প্রধান মন্ত্রী করে নিজে রাষ্ট্রপতি হবে। কর্ণেল ওজুকুয়ুকে হত্যা করা হবে, যেদিন কর্ণেল তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে স্থির করেছেন সেদিন।

আর একমুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত নয়। যে-কোন মুহূর্তে হয়তো অভ্যুত্থান হয়ে যেতে পারে। কর্ণেল আদেশ দিলেন ফিলিপ এবং ইফিয়াজুয়ানাকে বন্দী করতে। ভিক্টরকে ডেকে পাঠান হল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কৌশলে তাঁকে নিরস্ত্র করে বন্দী করা হল।

এদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা এবং রাষ্ট্রের প্রধানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনটে রাইফেল গর্জন করে উঠতেই তিনটি দেহ লুটিয়ে পড়ল বিয়ফ্রার ক্লেদাক্ত মাটিতে।

সুকৌশলে ভিক্টর কাহিনী প্রচার করা হল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। বেসামরিক জনসাধারণ এই কাহিনী জেনে শিউরে উঠল। বিয়াফ্রার আকাশে তখন থেকে মাঝে মাঝেই দেখা যেতে লাগল সোভিয়েট মিগ আর ইলিউসিন বিমান। বিয়াফ্রার আমেরিকান বি-২৬ বোম্বার চকিতের জন্য নাইজিরিয়ার আকশে উদিত হয়েই ছুটে চলে আসে আপন সীমানায়।

নাইজিরিয়া বাহিনী উত্তর এবং পশ্চিম দিক থেকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ শুরু করেছে। কর্ণেল মুর্তেলা বিভীষিকার মত নাইজার নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। তার প্রচণ্ড চাপে বিয়াফ্রা বুঝি এখুনি কালবৈশাখীর মুখে তৃণের মত উড়ে যাবে। কর্ণেল আচুনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছে মুর্তেলার সৈন্যবাহিনীর ওপরে। নাইজার নদীর তীরে হাজার হাজার সৈন্যসমাবেশ রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। এই

বাহিনী যদি নদী অতিক্রম করে বিয়াফ্রায় প্রবেশ করে তবে কারুর সাধ্য নেই সে গতিকে প্রতিরোধ করে। নাইজিরিয়া বাহিনীর সমাবেশ দেখে বিয়াফ্রার সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়।

কর্ণেল অচুজি তার অধীনস্থ অফিসারদের ডেকে যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসেন।

—আমার মনে হয় নদী পার হতে না দেওয়াই ভাল। একজন মেজর তার মতামত প্রকাশ করে।

—কিন্তু এই বিপুল সৈন্যবাহিনীকে আমরা কি বাধা দিতে পারব? তার চেয়ে কিছুসংখ্যক নদী পার হয়ে এলে আমরা সহজেই তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হব।

—ক্যাপ্টেন যা বলেছেন সেটা ঠিক। কর্ণেল নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলে—কিন্তু আমরা যখন এদিকে বাধা দেবার কাজে ব্যস্ত থাকব, সেই অবসরে নির্বিবাদে অন্য সৈন্যরা নদী পার হয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করবে।

—এত অল্প সৈন্য নিয়ে আমরা কিভাবে বাধা দেব। হেড-কোয়ার্টার থেকে আরো সৈন্য না এলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। অনাবশ্যক লোকক্ষয় করে লাভ কি?

—ক্যাপ্টেন কি প্রাণের মায়া খুব বেশী করেন?

—কে না করে, কর্ণেল সাহেব। তবে যুদ্ধে ভয় পাই না। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানতেই হবে। ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে বলে। মুহূর্তের মধ্যে তার মনে ভিক্টর কাহিনী উদিত হয়। যুদ্ধে সামান্যতম শিথিলতার সুযোগ পেলেই দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সে সম্ভাবনার পরিণতির কথা স্মরণ করলে শিউরে উঠতে হয়।

—আমার নির্দেশ, নাইজিরিয়াবাহিনী যেন নদী পার না হতে পারে। আমি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। কর্ণেল নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে যান।

অফিসের মধ্যে শোনা যায় গুঞ্জন। পশ্চিম রণাঙ্গণে বিয়াফ্রা পশ্চাদাপসরণ করার পর থেকে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা যায়। উত্তরে নাইজিরিয়াবাহিনী বিয়াফ্রার মাটিতে নিজেদের পাদস্পর্শ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

চিকচিক করছে নাইজার নদীর জল। হাওয়ায় ছোট ছোট তরঙ্গ তুলে কুলকুল স্বরে বয়ে চলেছে নদী, দক্ষিণে দূরে, বহু দূরে সাগরে। সূর্য ডুবে গেলেও আলোর রেশ একেবারে মিলিয়ে যায়নি। বহুদূরে দিগন্তরেখায় সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু আটকে রয়েছে। হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকার এসে তড়িৎগতিতে সব কিছু ঢেকে ছিল। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। খুব সন্তর্পণে দুটো নৌকো নাইজার নদীর বুকে ভেসে চলল। ছলাৎ ছলাৎ করে দাঁড় টানার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এপারের পাহারারত সৈনিক উৎকীর্ণ হয়ে অন্ধকারের মধ্যে চোখদুটো ছুঁচলো করে দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ করে তোলে। নৌকো দুটো আরো এগিয়ে আসছে।

গুড়ুম গুড়ুম। হাতের রাইফেল গর্জন করে ওঠে। দুজন নিহত সৈনিক জলের মধ্যে পড়ে যায়।

বুম্। নৌকো থেকে হ্যাণ্ডগ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। উৎক্ষিপ্ত মাটির সঙ্গে সঙ্গে একটি মনুষ্য দেহ শূন্যে উঠে আবার মাটির ওপরে ফিরে এসে নিথর হয়ে যায়। তীরভূমিতে সৈন্যবাহিনী সঠিক ভাবে নিজেদের অবস্থান করাতে সক্ষম হয়েছে। বারবার রাইফেল গর্জে ওঠে। নৌকোর পাশ দিয়ে, ওপর দিয়ে, মধ্য দিয়ে বুলেট ছুটে চলে গর্জন করতে করতে। কিছুতেই আর অগ্রসর হতে দিচ্ছে না।

ফট্ ফট্ ফট্। মেশিনগান গর্জন করে ওঠে নৌকো লক্ষ্য করে। নৌকো মুখ ঘুরিয়ে নেয়। প্রায় অর্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে।

কর্ণেল মুর্তেলা চিন্তাগ্রস্তভাবে ছাউনির মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন। নদী পার হতেই হবে। এভাবে নদী পার হওয়া সম্ভব নয়,

শুধু শুধু লোক ক্ষয় করে লাভ নেই। নতুন কোন পন্থা বের করার জন্য অধীর হয়ে পায়চারি করতে থাকেন তিনি। হঠাৎ মনের মধ্যে এক নতুন পরিকল্পনা খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী নির্দেশ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে।

একসঙ্গে অনেকগুলো নৌকো আবার নদীতে ভাসানো হল। এতগুলো নৌকো নদীর বিস্তৃর্ণ বুক জুড়ে এগিয়ে আসবে, একথা কর্ণেল আচুনি কল্পনা করতেও পারেননি। তবুও তার সৈন্যবাহিনী বাধা দেবার চেষ্টা করে। নদীর জল উত্তাল হয়ে মৃতদেহ নিয়ে বয়ে চলে। সকল বাধা তুচ্ছ করে দুর্ধর্ষ হৌসা সৈনিকরা বিয়াফ্রার মাটিতে এসে নৌকো ভিড়ায়।

হৈ হৈ করতে করতে তারা তীরভূমিতে পদার্পণ করে। কিন্তু প্রবল বন্যাকে মাটির বাঁধ দিয়ে আটকানো অসম্ভব জেনে কর্ণেল আচুনি তার বাহিনীকে পেছিয়ে আসার নির্দেশ দেন।

কর্ণেল মুর্তেলা অনায়াসে অনিৎসা শহরে প্রবেশ করে। খাঁ খাঁ করছে শহর। শহরের অধিকাংশ অধিবাসীরা পালিয়েছে। যারা রয়েছে তারা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে সন্ত্রস্তভাবে দিন কাটায়।

সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে শহর ছেড়ে গ্রামের পথে। বিয়াফ্রার মাটি নিজেদের দখলে রাখার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে যায় তারা। একটা দল উৎসাহের সঙ্গে সবার আগে আগে চলতে থাকে। সন্ধ্যে হতেই দেখে, তারা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। অন্ধকারে গাছপালার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তারা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায়। আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে একটা ফাঁকা বাড়ী দেখে সেখানে তারা আশ্রয় নেয়।

ঘরের পেছনে খস্‌খস্‌ আওয়াজ হতেই পাহারারত সৈনিক ঘুমন্ত আর চারজনকে ডেকে তোলে। ধড়মড় করে উঠে বাইরে বেরিয়ে আসে তারা। নিসীম অন্ধকারের মধ্যে কিছু দেখতে না পেয়ে

একজন জিজ্ঞেস করে—হ্যারে, কিসের শব্দ শুনেছিস, শেয়াল টেয়াল নয় তো।

—না, স্পষ্ট মানুষের পায়ের শব্দ শুনছি।

—তবে গেল কোথায়।

—নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। চল সব একটু ভাল করে খুঁজে দেখি।

—চল চল বাছাধনের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিই।

বেরিয়ে পড়ে তারা। বেয়নেট শুদ্ধ রাইফেল খুলে ধরে অত্যন্ত সন্তর্পণে এগোতে থাকে। একটা ঝোপের পাশে আসতেই একজন ছুটে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে ওঠে রাইফেল।

—ডানদিক দিয়ে যা তোরা। বলেই সৈনিকটি বাঁ দিক দিয়ে ছুটে চলে।

যে দিকে লোকটা ছুটে গেল, সেদিকে দুপাশ থেকে ঘিরে ধরে তারা দৌড়ে চলে। ছোট্ট একটা ঝোপের সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়ায় তারা, কোথাও নেই মানুষটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চতুর্দিকে চোখ বুলোতেই একজনের নজর পড়ে, ঝোপটা যেন একটু নড়ে উঠল। মুহূর্ত-মাত্র বিলম্ব না করে খোলা বেয়নেট ঝোপের মধ্যে চালিয়ে দেয়। বেয়নেট সোজা গিয়ে মানুষটার বুকে গেঁথে গেছে। চিৎকার করে কঁকিয়ে উঠতেই আর একজনের রাইফেল গর্জন করে ওঠে। রাইফেলের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই একটা হাতবোমা এসে পড়ে ঠিক তাদের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ে তারা। মাটিতে শুয়ে বুকে হেঁটে চলতে থাকে বাড়ীটার দিকে। আরো কিছুটা অগ্রসর হতেই একঝাঁক বুলেট মাথার ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে যায়। মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ মরার মত পড়ে থেকে আবার উঠেই ছুটতে শুরু করে। এবার ঠিক মাঝখানে একটা বোমা প্রচণ্ড শব্দ করে ফাটে। বোমার আঘাতে উঁচু হয়ে মাটি ধুলোর সঙ্গে একজনের মুণ্ড আর একজনের একটা হাত অনেকটা উপরে উঠে আবার নীচে

নেমে আসে। আবার রাইফেলের গর্জন। এবার আর এগোনোর বা পেছবার কোন উপায় নেই। সামনে পেছনে যেদিকে যাবার চেষ্টা করে সেদিক থেকেই আক্রমণ হতে থাকে।

তবু তারা তিনজন রাইফেল খুলে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করে। রাইফেলের গুলি বারবার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। গাছের আড়ালে থাকার জন্য এতক্ষণ নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল কিন্তু এবার বুঝি তাও সম্ভব হয়না। দুদিক থেকে ওরা আক্রমণ করেছে। এরাও রাইফেল ছুড়ে বাধা দেবার চেষ্টা করে। তিনজন পিঠেপিঠ দিয়ে তিনদিকে রাইফেল ছুঁড়তে থাকে। বাঁ পাশের সৈনিকটি পর মুহূর্তে রাইফেল ছুঁড়েই ঢলে পড়ে। আর দুজন মাথার উপরে হাত তুলে এগিয়ে আসে।

কর্ণেল আচুজির তীব্র আক্রমণে নাইজিরিয়া সৈন্যবাহিনী পেছু হটতে থাকে। পেছু হটতে হটতে তারা অনিৎশা সহরে এসে ঘাঁটি করে বিয়াফ্রা বাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে থাকে। বিয়াফ্রা সৈনিক আবার শহর নিজেদের দখলে আনাবার চেষ্টা করে।

এত চেষ্টা করেও কিন্তু উত্তরে বিয়াফ্রা বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে, ক্রমাগত তারা পেছু হটতে থাকে। সামনা সামনি যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝতে পেরে মেজর রালফ্ স্টেইনারের নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী অগ্রসর হয়। মেজর স্টেইনার জার্মান থেকে এদেশে এসেছেন বহুদিন। বিয়াফ্রা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তিনি।

বিছিন্ন ভাবে গেরিলারা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সুযোগমত ঝাঁপিয়ে পড়ে উড়িয়ে দেয় গোটা সৈন্যবাহিনী অথবা তাদের অস্ত্রাগার কিংবা রসদের ব্যারাক।

নসুক্কা শহর দখল করে নাইজিরিয়া বাহিনী এনগুর পথে অগ্রসর হচ্ছে। মেজর স্টেইনার তার গেরিলা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন এই অগ্রগতি রোধ করার জন্য। আশেপাশের গ্রাম থেকে সাধারণ

মানুষেরা আরো দক্ষিণে সরে গেছে। লোকজন নেই বললেই চলে যারা রয়েছে তারা প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের সম্মুখীন। স্বাভাবিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এক একটা গ্রামে কতকগুলো সংযোগহীন মানুষ অসাধারণ দুর্গতির মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। গ্রামে গবাদি পশু নেই বললেই চলে, যা রয়েছে তাও চলে যাচ্ছে সৈন্যবাহিনীর রসদ হিসেবে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে একটি গোরিলা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পিঠের ভারী ঝোলাটা নামিয়ে গাছের তলায় শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে সে। ঘুমুলেও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। যে কোন মুহূর্তে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতে পারে। মাথার কাছে রাখা র‍্যাশন ব্যাগ খোলার আওয়াজ হতেই লাফিয়ে উঠে রাইফেল খুলে ধরে।

একটা মেয়ে। ধরা পড়ে হি হি করে হাসতে থাকে। কতদিন পরে মেয়ের মুখ দেখল। সেই কবে বাড়ী ছেড়েছে, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে দেখেনি। ধীরে ধীরে রাইফেলটা নামিয়ে নেয়। ব্যাগটা নিজের কাঁধের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখতে থাকে। মেয়েটি কিন্তু এতটুকুও ভয় পায়নি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখে চোখে অবসাদের চিহ্ন স্পষ্ট, অত্যন্ত দুর্বল, রুগ্ন বোধহয় খাওয়া জোটেনি দিন কয়েক। কেমন যেন করুণা বোধহয়, ভালবাসতে ইচ্ছে করে। নারীদেহ লোলুপতা জাগিয়ে তোলে।

এক অদ্ভুত হাসিতে জায়গাটা মনোরম করে তোলে মেয়েটা। কোন কথা না বলে সৈনিকটি তার একটা হাত ধরে, সে ছাড়িয়ে নেয় না, বরং আরো একটু কাছে এগিয়ে আসে।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে একটা বাড়ীতে এসে পৌঁছয়। ছোট্ট কাঁচা বাড়ী। ঘরের মধ্যে একপাশে কেরোসিনের লণ্ঠন। আলোর চেয়ে বেশী ধুম উদগারণ করছে। ঘরে আর কেউ নেই। নির্জন ঘরে সৈনিকটি মেঝেতে বসে পড়ে।

—আর কেউ নেই এখানে।

—আমার এক বোন আছে।

—সে কোথায় ?

—বোধহয় খাওয়ার জোগাড় করতে গেছে।

—এছাড়া আর কেউ নেই।

—ছিল, পালিয়েছে সবাই। ব্যাগ খোল দেখি কি আছে। তাড়াতাড়ি কর।

—কতদিন খেতে পাওনা তোমরা।

—সে শুনে কী হবে। মেয়েটি হেসে ফেলে।

তার হাসিতে সৈনিকটির মনের মধ্যে তীব্র জ্বালা দেখা দেয়। কোন কথা না বলে সে এক ঝটকায় নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেয় মেয়েটিকে। একটু বাদেই মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—একটু ভালবাস। সৈনিকটি আর্তকণ্ঠে মিনতি জানায়।

—সময় নেই। আরো খাবারের সন্ধানে বের হতে হবে। উঠে পড়।

মেয়েটি উঠে র‍্যাশন ব্যাগ খালি করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সৈনিকটি হতভম্বের মত চেয়ে থাকে। মেয়েটি যেদিক দিয়ে বের হয়ে গেছে সেদিকে পা বাড়ায়। অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না। পাশের একটা ঘর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। এগিয়ে গিয়ে ঘরটার পাশে সে দাঁড়ায়। এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

—একটু সোহাগ কর, কতদিন আদর পাই না।

—সময় নেই। আরো খাওয়ার নিয়ে এস। একটি মেয়ের রূঢ় কণ্ঠস্বর।

দোহাই তোমার। পুরুষটি মিনতি জানায়।

ঘরের ভিতর থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এসে তাকে দেখে অবাক হয়, পরমুহূর্তে চকিত হাসিতে কিসের যেন ইংগিত করে। একটু বাদেই ঘর থেকে একজন সৈনিক বেরিয়ে আসে। চমকে ওঠে সে। ছোসা।

সৈনিকটি বেরিয়ে এসেই হতচকিত হয় যায়। সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন ইবো গেরিলা।

গুড়ুম! গুড়ুম!! দুজনের রাইফেল গর্জে ওঠে একসঙ্গে। দুটি মৃতদেহ মাটিতে একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ে। খিলখিল করে হেসে ওঠে দুজনে।

নাইজিরিয়া সৈন্য বাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে আসছে, বিয়াফ্রার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। স্টেট হাউসে কর্ম ব্যস্ততার শেষ নেই। বার বার ফোন বেজে উঠছে। কর্ণেল ওজুকুয়ু একটার পর একটা ফোন করে চলেছেন।

আবার ফোন বেজে উঠল।—হ্যালো…আর্মি চিফ্ স্পিকিং…

—ইয়েস, বিমানবন্দর এখনো কাদের হাতে, নাইজিরিয়া বাহিনী ঠিক কতদূর এসেছে।…

—বিমান বন্দরের বাইরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে। রাণওয়ে বম্বিংয়ের ফলে নষ্ট হয়ে গেছে, বোধহয় আর রক্ষা করা যাবে না।

—যে কোন উপায়ে রক্ষা করতে হবে। আমাদের কোন প্লেন আছে ওখানে?

—আছে কয়েকটা।

—সেগুলোকে উলি এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। সঙ্গে যতটা সম্ভব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিন।

—অসম্ভব স্যর, প্লেন এখন আকাশে উঠলেই আক্রমণ করবে। আরো অস্ত্র প্রয়োজন। সাপ্লাই লাইন বার বার ফেল করছে। অস্ত্রের অভাবে হয়তো এখানকার আর্মিরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

—হ্যালো…হ্যালো…হ্যালো …..

খট্ করে রিসিভার রেখে দিলেন কর্ণেল। লাইন কেটে গেছে। চিন্তিত মুখে তিনি আকাশের দিকে চাইলেন। নির্মল আকাশ, শীতের আমেজ একটু একটু করে পড়ছে। কদিন আগেও নাইজিরিয়া

থেকে প্রচার করা হয়েছে বিয়াফ্রার পতন আসন্ন। সত্যি কি বিয়াফ্রার পতন হবে। আবার হৌসাদের পদানত হতে হবে? অসম্ভব।

কর্ণেলের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। তার দৃষ্টিতে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। প্রচণ্ড আক্রমণ করতেই হবে। গোটা দেশকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবীত করে তুলতে হবে।

দেওয়ালে টাঙানো বড় ম্যাপটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কর্ণেল। কখন অজ্ঞাতসারে এনুগুর ওপরে একটা আঙুল গিয়ে থেমে গেছে। সম্বিত ফিরে পেতেই আবার টেলিফোনের কাছে এসে ডায়াল করেন।

—ইয়েস কর্ণেল স্পিকিং ··এখুনি সংবাদ দিন, সে আমি জানি··· যেমন করে হোক অস্ত্র আনতেই হবে···এক সপ্তাহের মধ্যে ভাল রকম সাপ্লাই চাই···চতুর্দিকে নাইজিরিয়ান সৈন্য তার মধ্য দিয়েই আনতে হবে।···

রিসিভার রেখে কর্ণেল একটু আশ্বস্ত হন। আর দিন কয়েকের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ এসে যাবে। আবার পূর্ণোদ্যমে সাজ সাজ রবে নেমে পড়বেন যুদ্ধক্ষেত্রে। নাইজিরিয়াকে দেখিয়ে দেবেন জনকয়েক সামরিক বাহিনীর অফিসারের চক্রান্ত নয় এটা, একটা সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রকাশ এ যুদ্ধ। এতকাল অপরের বুটের নীচে অনেক অন্যায় সহ্য করে মাথা পেতে ছিল। কিন্তু আর নয়, এবার তারা স্বাধীন, নিজ মাতৃভূমি রক্ষা করার সাহস তাদের আছে।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

—ইয়েস—বিমান বন্দর শত্রুবাহিনীর হাতে গেছে ··সহরের দিকে তারা মার্চ করে আসতে শুরু করেছে···সোভিয়েট মিগ ওদের পাহারা দিয়ে আনছে···আপনি শীগগীর চলে আসুন।

কর্ণেল ওজুকুয়ু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ক্রশবেল্টে বাঁধা রিভলবারটা টেনে সামনের দিকে খুলে ধরলেন। না, কেউ নেই সামনে, তবে, তবে তিনি কার দিকে তাক করছেন? আবার খাপের মধ্যে রিভলবার

ঢুকিয়ে রাখেন। গোঁ-গোঁ করে একটা গাড়ী গর্জন করে ওঠে। উদগ্রীব হয়ে ওঠেন তিনি। এক, দুই, তিন, চার···না কেউ তো এল না। আকাশে প্লেনের শব্দ হতেই ছুটে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। কাদের প্লেন? কে জানে। নাইজিরিয়া সৈন্যবাহিনী মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসছে। সহরের মধ্যে বিনা বাধায় ঢুকে পড়ল ওরা। হল্লা আর প্রচণ্ড উল্লাসে ডবল মার্চ করতে করতে ছুটে আসছে। লোকজন পাল্লাতে শুরু করেছে না স্বাগত জানাচ্ছে বিদেশী সৈন্যবাহিনীকে? কে জানে! সবাই মার্কেট স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। একটি দোকানও আজ আর খোলা নেই। নিভে গেছে ঝলমলে আলোকসজ্জা, স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রাণোচ্ছাস। শুধু সর্পিল পিচের রাস্তটা নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে, খোলস ছাড়া-সাপের মত। স্টেট হাউস ঘিরে ধরেছে নাইজিরিয়ান সৈন্যবাহিনী। ঐ তো ওদের অফিসার তার সৈনিকদের নিয়ে অনায়াসে গেটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। কোন বাধাই দিল না গেটের রক্ষী। ছুটে এগিয়ে আসছে তারা, সিঁড়ির ওপরে ভারী বুটের শব্দ হতে থকে। বীরের মতই মৃত্যু বরণ করবেন কর্ণেল। রিভলবারটা খুলে ধরে এগিয়ে আসেন।

গুড়ুম্। কানের পাশ দিয়ে শোঁ করে গুলিটা বেরিয়ে যায়।

—একি কর্ণেল, আপনি গুলি ছুড়ছেন?

—ওঃ আপনি। কর্ণেল রিভলবারটা খাপের মধ্যে রেখে দিয়ে শান্ত হয়ে বসেন। দুকান দিয়ে আগুন ছুটছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে কপালে, থর থর করে কাঁপছে পা দুটো। টেবিল থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেন।

—বলুন, কি খবর?

—কোন উপায় নেই, এনুগুর পতন আসন্ন।

—তবে কি আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে? অসম্ভব জীবন থাকতে গওনের হাতে ধরা দেব না। কি ব্যবস্থা করতে পারেন আপনি?

—আপনি যেমন নির্দেশ দেবেন।

—আরো কতক্ষণ এই সহর আমাদের দখলে থাকবে বলে [illegible]নে হয়?

—ঘণ্টা দুয়েক তো বটেই।

—বেশ, প্রস্তুত হোন, এইদু ঘণ্টার মধ্যে বিয়াফ্রা সরকার স্থানান্তরিত হবে উমুয়াহিয়ায়।

—ইয়েস স্যর। অভিবাদন করে আর্মি চিফ বেরিয়ে যান।

আরো কিছুক্ষণ বাদেই এনুগুর অধিবাসীরা দেখল তিন চারটে হলিকপ্টার আর একটা জেট প্লেন দক্ষিণ আকাশে ভেসে যাচ্ছে।

সবাই জেনে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নাইজিরিয়ান বাহিনী [illegible]হরের মধ্যে প্রবেশ করবে। বিয়াফ্রা সরকার রাজধানী ছেড়ে চলে গছে নিরাপদ অঞ্চলে। রাগে দুঃখে মানুষের মনে নিদারুণ হতাশা এসে দেখা দেয়। যারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন তারা সহর ছেড়ে যতে আরম্ভ করেছে। ট্রেনে, বাসে, গাড়ীতে, পায়ে হেঁটে, যে যেভাবে [illegible]ারছে সহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে।

রাস্তাঘাট লোকজনে ভর্তি, সবার মুখে দারুণ শঙ্কা। কি এক প্রলয় কাণ্ড যে এখুনি আরম্ভ হয়ে যাবে কেউ তা কল্পনাও করতে [illegible]ারছে না। পেছন থেকে এক অদৃশ্য শত্রু তাদের তাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে চলেছে। দলে দলে উদ্বাস্তু মানুষ হাতে বহনযোগ্য সামান্য জনিষপত্র নিয়ে চলেছে দক্ষিণে, আরো দক্ষিণে।···কোথায় যাচ্ছে, কেউ [illegible]ানে না, শুধু জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে [illegible]লেছে। জন কয়েক সামরিক বাহিনীর অফিসারের ব্যক্তিগত খয়ালখুশীতে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ এক অসাধারণ দুর্গতির [illegible]ধ্য দিয়ে দুর্বিসহ জীবন টেনে নিয়ে চলেছে। নাইজিরিয়া বা বিয়াফ্রা কানটাই আজ বিচার করার সময় নেই, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই [illegible]বাই ব্যস্ত।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে অশোক একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। এত মানুষ এক জায়গায় বাসের জন্য অপেক্ষা করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। একটা বাস থেমে রয়েছে। চালান দেবার জন্য খাঁচায় করে মুরগী যেমন ভর্তি করা হয় বাসটারও সেই অবস্থা। এমন কি ছাদের উপরেও অনেক লোক উঠে বসেছে। বাসটার অবস্থা দেখে সন্দেহ হয় শেষ পর্যন্ত বাসটা যেতে সমর্থ হবে, কি না।

বাসটা চলে গেল। হাজার হাজার মানুষ নিরাশায় কঁকিয়ে উঠে। সহরের মধ্যে হৌসা বাহিনী ঢুকে গেছে। কে যেন ফিস ফিস করে বলল।

হঠাৎ সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে যেমন ধানগাছগুলো পর পর আন্দোলিত হতে থাকে, তেমনি করে জমাটবদ্ধ মানুষগুলো একসঙ্গে নড়েচড়ে উঠল। ফিস ফিস করে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল হৌসারা আসছে। বরফ গলার মত একটু একটু করে এগোতে থাকে সব। তারপর ভিড় একটু পাতলা হতেই ছুটতে আরম্ভ করে। শিশু নরনারী সবাই ছুটছে একসঙ্গে।

ঘ্যাস করে পায়ের কাছে একটা গাড়ী এসে থেমে গেল।

—অশোকবাবু ভেতরে আসুন।

গাড়ীর দিকে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেল মিস মেহতা ভেতর থেকে ডাকছেন। গাড়ীতে আরো জনকয়েক আরোহী। তাদের মধ্যে কয়েকজন সাহেব মেমও রয়েছে। এরাও শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর মত।

—আসুন, সময় বেশী নেই।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

—আপাতত আওগুতে, তারপর দেখা যাবে।

—আপনি একা, বাড়ীর আর সবাই কোথায়।

—বাবা এখানেই রয়ে গেলেন, অনেক বলেছিলাম তার এক কথা—আমি ইণ্ডিয়ান আমার কোন ভয় নেই।

—আমিও তো ইণ্ডিয়ান, আমারই বা ভয় কিসের ?

—তবে হাতে স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়েছেন কেন ? লক্ষ্মীটি সময় নষ্ট করবেন না, উঠে আসুন। গণ্ডগোলের সময় কেউ অত খেয়াল করে না কে আফ্রিকান আর কে ইণ্ডিয়ান।

—কিন্তু জায়গা কোথায় ? একেবারে তো ভর্তি।

—হয়ে যাবে, এই আমি জায়গা করে দিচ্ছি, প্লীজ, তাড়াতাড়ি উঠে আসুন। মিনতি ভরা চোখে মীরা অশোকের দিকে তাকায়।

আর কোন কথা না বলে অশোক গাড়ীতে উঠে বসে। তীব্র গতিতে গাড়ী ছুটে চলে। রাস্তায় যেতে যেতে অশোক দেখে অসংখ্য উদ্বাস্তু নিজেদের মোটঘাট নিয়ে চলেছে। ছোট ছোট শিশুগুলো বার বার চিৎকার করে কেঁদে উঠছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা হাঁটতে হাঁটতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষ মরে রয়েছে পথের ধারে। শকুনি আর কুকুর ঘিরে ধরেছে তাদের মৃত দেহ। তবু তারা চলেছে··· নাইজিরিয়া ছেড়ে বিয়াফ্রায়।

পেছনে নাইজিরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী মার্চ করতে করতে এনুগু শহরে প্রবেশ করে।

॥ সাত ॥

সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে। জ্বলে উঠেছে আলো, লাউঞ্জেও কেউ কেউ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুল্ক বিভাগের অফিসাররা সন্দিহান হয়ে এদিক ওদিক চাইছে। বিভিন্ন কোণে সামরিক বাহিনী অত্যন্ত সন্তর্পনে পাহারা দিচ্ছে। বিমান বন্দর মিলিটারী ঘিরে ফেলেছে। বেসামরিক যাত্রী যারা রয়েছে তাদের বিশ্রামাগারের বাইরে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। আর মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একটা বিমান এসে পৌঁছবে। সামরিক বাহিনীকে খবর দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য জন আকুয়াও সতর্ক হয়েছেন। কাঁধের ব্যাগটার মধ্যে ক্যামেরাটা একবার স্পর্শ করে দেখে নেয় ঠিক আছে কিনা। ফিল্মের রোলগুলো ব্যাগের মধ্যে পড়ে রয়েছে। জন ধীরে ধীরে ক্যান্টিনের মধ্যে একটা চেয়ারে এসে বসেন। এক কাপ কফি নিয়ে শান্ত ভাবে চুমুক দিতে থাকেন। আশে পাশে যারা রয়েছে, তারা অনুচ্চ কণ্ঠে যুদ্ধের গল্প করতে থাকে। নাইজিরিয়ার ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয়েছে, বিয়াফ্রার পতন হয়নি, তবে দিনের পর দিন বিয়াফ্রার পরাজয় ঘটেছে। প্রতিদিনই গুটি গুটি পেছিয়ে আসতে হয়েছে। স্থলপথে বিয়াফ্রার যোগাযোগ ছিল ক্যামেরুণের সঙ্গে, সে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তখনও জল ও আকাশ পথে যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে হয়তো খুব বেশী দিন আর থাকবে না। তিন দিক দিয়ে নাইজিরিয়া বাহিনী ঘিরে ধরেছে। বার বার প্রচণ্ড চাপ পড়ছে পোর্ট হারকোর্টের ওপরে। এই বন্দরটি হাত ছাড়া হয়ে গেলে বিয়াফ্রার আকাশ পথ ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

জন হাতঘড়ি দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ক্যান্টিন থেকে

বের হয়ে লাউঞ্জে এসে অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। সোজা পথে যাবার কোন উপায় নেই। সামরিক বাহিনী যে ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাতে যাওয়া অসম্ভব।

রাস্তা দিয়ে বের হয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে রাণওয়ের দিকে জন এগিয়ে গেল। রাণওয়ে ধরে অনেকটা পেছিয়ে এসে একটা প্লেনের পেছনে লুকিয়ে রইল।

কিছুক্ষনের মধ্যেই আকাশে একটা বিমান দেখা যায়। এয়ার-পোর্টের ওপরে বারকয়েক চক্কর দিয়ে রাণওয়ে ধরে সোজা এগিয়ে গিয়ে বিমানটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দ্রুত জন কয়েক অফিসার ছুটে এসে ঘিরে ধরল বিমানটিকে। প্রাইভেট কোম্পানীর একটি বিমান। দরজা খুলে একজন লোক নেমে এসে অফিসারকে কী যেন বলে আবার বিমানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তার পেছু পেছু জন চারেক লোক ভেতরে গিয়ে কাঁধে করে বড় বড় প্যাকিংবক্স নামিয়ে আনে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক্ ক্লিক্ করে আওয়াজ হয় জনের ক্যামেরার। বিদেশ থেকে গোলাবারুদ আমদানী হচ্ছে বিয়াফ্রায়, তার অক্ষয় সাক্ষী বন্দী হয়ে রইল জনের ক্যামেরায়।

জন দ্রুত এগিয়ে এল। যে কোন সময় বিপদ দেখা দিতে পারে। পেছনে তাকিয়েই সে সোজা ছুটতে আরম্ভ করে, একজন সৈনিক দৌড়ে আসছে তার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈনিকটি দৌড়ে এসে তার কলার চেপে ধরে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে একটা গালাগাল দেয়।

—কী ব্যাপার? জন বেশ জোরে জোরে বলে।

—ওদিকে গিয়েছিলেন কেন?

—কোনদিকে আবার গিয়েছিলাম? এই তো সবে এখানে এসেছি।

—চলুন, আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে।

সৈনিকটি জনকে ধরে নিয়ে এল আর্মি অফিসে। তিন চারজন

অফিসার গম্ভীর হয়ে একটা টেবিল সামনে রেখে বসে রয়েছে। দরজার কাছে দুজন সৈনিক বেয়নেট শুদ্ধ রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। অফিসারেরা জনকে সামনের চেয়ারে বসার নির্দেশ করে।

—আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

—আমার অপরাধ। নিরুত্তাপ কণ্ঠে জন আকুয়া উত্তর দেয়।

তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে দণ্ডায়মান সৈনিকটিকে নির্দেশ দেয়—ক্যামেরাটি কেড়ে নাও।

কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সৈনিকটি ব্যাগের মধ্য থেকে ক্যামেরাটি নিয়ে অফিসারের হাতে দেয়। ক্যামেরাটা নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকে অফিসার। বার কয়েক সার্টার টিপতেই শব্দ হয় ক্লিক্ ক্লিক্।

—ভেতরের ফটোগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আর্তকণ্ঠে জন বলে।

আমি জানি। স্মিত হেসে উত্তর দেয় অফিসার।—আপনি এয়ার পোর্টের ফটো তুলেছেন?

—না।

—বাজে কথা বলবেন না, এখুনি যে প্লেনটা এল তার ফটো তোলেন নি।

—না।

—আবার বাজে কথা বলছেন? রেগে উঠে রিভলবার খুলে ধরে চিৎকার করে বলে—যদি বাঁচতে চান সত্যি কথা বলুন। মাল খালাসের ছবি তোলেন নি আপনি?

—হ্যাঁ।

—তবে? টেবিলের উপরে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে বলে—কেন তুলেছেন?

—ছবি তোলা কি নিষিদ্ধ? এমন কি মাল আছে যার ছবি তোলা নিষেধ।

—সাধারণ জিনিষ হলে নিশ্চয়ই ছবি তুলতেন না। আমার কথা

শুনুন, আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি এক সর্তে যদি ছবিগুলো এখুনি নষ্ট করে ফেলেন।

—অনেক কষ্টে তুলেছিলাম। মিনতি করে জন।

—মাই অর্ডার। চিৎকার করে ওঠে অফিসার।—এখুনি, এই মুহূর্তে, নিন ক্যামেরা খুলুন। কি হল?

জন ক্যামেরাটা খুলে ফিল্ম টেনে বের করে অফিসারের সামনে রাখে। অফিসারের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ফিল্মটা নিয়ে শূন্যে তুলে একবার দেখে নিয়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে—যান, ভবিষ্যতে আর এধরণের কাজ করবেন না।

বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে জন জুতোর মধ্য থেকে একটা রোল ফিল্ম বের করে চোখের সামনে তুলে ধরে। ঠিকই আছে। দৌড়তে দৌড়তে তার কেন জানি হঠাৎ মনে হয়েছিল ফিল্মটা সরিয়ে ফেলা দরকার। ছবিতোলা ফিল্ম পাল্টে একটা নতুন ফিল্ম ভরে রেখেছিল, সেটা নষ্ট হল।

এক লাফে জন পাশে সরে দাঁড়ায়, আর একটু হলেই চাপা পড়ত!

—কানে শোনেন না নাকি? গাড়ী থেকে একটা মেয়ে নেমে চোটপাট করতে শুরু করে।

জন তার দিকে চেয়ে দেখে। কুঞ্চিত কেশ দাম বব করে ছাঁটা, পরনে মিনিস্কার্ট। আঁটসাঁট পোষাক তীক্ষ্ণ হয়ে চোখে খোঁচা দেয়। কালো পুরুষ্ট ঠোঁটে ফ্যাট ফ্যাট করছে লিপষ্টিকের রক্তাভা।

—আরে, জন আপনি? চিনতে পারছেন না?

এবার জন চিনতে পেরেছে। মিস এডেকুনলে। লজ্জিত হয়ে বলে—চিনতে পেরেছি। আমেরিকা থেকে কবে এসেছেন?

—কিছুদিন হল, আবার ইউরোপেও গিয়েছিলাম, সেখান থেকে দিন সাতেক হল ফিরেছি। সম্ভবতঃ সামনের সপ্তাহে আবার লণ্ডন যাব। কোথায় গিয়েছিলেন এয়ারপোর্ট?

—হ্যাঁ।

—আমিও সেখান থেকেই ফিরছি। উঠে আসুন। একি লজ্জার কি আছে। না, না, সামনের সিটে বসুন।

জন মিস এডেকুনলের পাশে বসে। গাড়ী আবার চলতে থাকে। জনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনেকদিন আগে দেখা এক সলজ্জ আফ্রিকান তরুণীর চেহারা। সে চেহারার সঙ্গে আমেরিকা প্রত্যাগত এ তরুণীর চেহারার অনেক তফাৎ। সলজ্জ নম্রতার ওপর রুক্ষ ইয়াংকি আচরণের কঠোর ছাপ।

মিস এডেকুনলে আবার বলে—কতগুলো ছবি পাঠালাম ফরেন জার্নালে, ভাল দাম পাওয়া যাবে। আরো কিছু তুলতে হবে, যাবেন রেফিউজি ক্যাম্পে ?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় জন।

—কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন য়ুরোপের কাগজগুলোতে বিয়াফ্রা নিয়ে খুব হৈ চৈ করা হবে।

—আপনি জানলেন কী করে ? বিস্মিত হয় জন।

একটু স্মিত হেসে মিস্ এডেকুনলে বলে—ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুদিন আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিয়াফ্রা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে জানেন বোধহয়। তারজন্য লণ্ডনে কম ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। আবার লণ্ডনে যেতে হবে জনমত তৈরী করার জন্য। নাইজিরিয়ার ওপরে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ব্রিটিশ সরকার বড্ড গোলমাল আরম্ভ করেছে।

জন অবাক হয়ে চেয়ে দেখে। কী সাবলীল বলার ভঙ্গী। আগে কথার মধ্যে কেমন জড়তা ছিল, রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না। আর এখন পাকা রাজনীতিকের মত ঝরঝর করে বলে চলেছে নেপথ্য কাহিনী।

মনে পড়ছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঝড় উঠেছিল। এ বছরের প্রথম দিকে লর্ড ব্রুকওয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন তুলেছিলেন নাইজিরিয়াকে অস্ত্র পাঠান হয় কি না। প্রথম প্রথম সরকার এড়িয়ে গেছে সে প্রশ্ন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরেন সেক্রেটারী মাইকেল স্টুয়ার্ট এবং প্রধানমন্ত্রী উইলসন স্বীকার করেছেন নাইজিরিয়াকে ব্রিটেন অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। বিয়াফ্রা নাইজিরিয়া নিয়ে যেদিন পার্লামেণ্টে বিতর্ক হয় সেদিন পার্লামেণ্টে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়! অসংখ্য সদস্য সরকারকে আসামীর কাট-গড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করে, কেন ব্রিটেন একটি দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে এক পক্ষকে সমর্থন করছে। বিয়াফ্রার সার্থক সদস্যরা সরকারকে নিরপেক্ষ থাকতে বলে। তাদের উদ্দেশ্য যদি ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকে তবে বিয়াফ্রা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে যে সাহায্য লাভ করছে তার দ্বারা দীর্ঘ-মেয়াদী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। সরকার কিন্তু তীব্র আক্রমণে বিচলিত হননি। তাঁদের বক্তব্য নাইজিরিয়ায় একটি স্বীকৃত সরকার রয়েছে। সে সরকারের সঙ্গে ব্রিটেনের কূটনৈতিক সম্পর্কও রয়েছে। যদিও ব্রিটিশ সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী নয়।

একটা খোলা মাঠের সামনে গাড়ী থেমে গেল। জন, মিস এডেকুনলের সঙ্গে নেমে এল। বেশ বড় রেফিউজি ক্যাম্প। কয়েক হাজার ইবো শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। সবাই নাইজিরিয়া অধিকৃত অঞ্চল থেকে এসেছে। ছোট ছোট শিশুগুলোকে দেখলে সত্যি কষ্ট হয়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এদের চেহারা এমন হয়েছে যে মানুষ বলেই মনে হয় না। সরু সরু হাত পা, পেট বিরাট হয়ে সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়েছে, দেহের তুলনায় মাথাটা বড়।

এক একটা পরিবার সামান্য একটু চৌহদ্দি ঘিরে নিজের নিজের অধিকার বজায় রাখার চেষ্টা করছে। এইটুকু জায়গাতেই তাদের খাওয়া থাকা শোওয়া ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা অতিবাহিত করতে হয়।

—নাইজিরিয়া সরকার এর জন্য দায়ী। বিয়াফ্রায় এখন চারলক্ষ রেফিউজি।

রাজনীতির কথা না বলে নেপথ্য কাহিনী জানার আগ্রহে জন বলে এদের রিলিফের কোন ব্যবস্থা হয়নি।

—নিশ্চয়ই, সরকার পক্ষ থেকে করা হয়েছে। কিন্তু খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব, বিশেষ করে খাদ্যাঞ্চল নাইজিরিয়ার দখলে চলে যাওয়ার পর থেকে আরো মুস্কিল দেখা দিয়েছে।

—তবে এই লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যাবে ?

—কাগজে লিখুন না এদের কাহিনী। এই মানুষগুলো কী দোষ করেছে। আজকের সভ্য সমাজে এভাবে না খেতে দিয়ে মারার পরিকল্পনা করা, ভাবতেই পারা যায় না। আপনাদের দায়িত্ব এবিষয়ে অন্য কাজের চেয়ে কম নয়।

—আপনারাই বা কী করছেন।

—বিয়াফ্রার আন্তর্জাতিক রেডক্রশের প্রতিনিধি মিঃ হেনবিক্ জ্যাগ্‌গি জেনেভায় আবেদন জানিয়েছেন। দেখা যাক কী হয়। এছাড়াও বিশ্ব চার্চ সম্মেলন এবং অন্যান্য সংস্থার কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

—তবে এবার নিশ্চয় খাদ্য পাওয়া যাবে। বিশেষ করে মার্কিনরা এসব বিষয়ে মুক্ত হস্ত। তারা মানুষের ক্ষুধার সময় অনেক কিছু করে।

মিস এডেকুনলে জনের দিকে চোখ তুলে তাকায়। জন বুঝতে পারে কথাটা। তার মনঃপুত হয়নি। চুপ করে থাকে সে, আর কথা বাড়াতে চায় না।

—মার্কিনদের জন্য বিয়াফ্রা এখনো টিকে আছে, এটা জানবেন মিঃ আকুয়া।

অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তাদের পেছু নিয়েছে। তাদের হয়তো ধারণা এরা কর্তা ব্যক্তিদের কেউ, খাবার বা পয়সার লোভে পেছুপেছু ঘুরঘুর করে। আবার কেউ ছোট ছোট ভাইবোনদের হাত ধরে অব্যক্ত ভাষার চাহনি নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। একটা মেয়ে একটু আলাদা হয়ে জনের দিকে চেয়ে রয়েছে। বছর ষোল

সতের বয়স, যৌবন সবে মাত্র আসতে সুরু করেছিল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। কৃশ, দুর্বল চেহারাটা নিয়ে সে জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিছু বলার জন্য যেন সে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

মিস এডেকুনলে খোঁজাখুজি করে একটা বছর তিনেকের ছেলে ধরেছে। তার চেহারা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। মাথায় বিরল কেশ, হাত পাগুলো কাঠির মত সরু সরু, পেটটা ফুলে রয়েছে, ভাল করে দাঁড়াতে পারে না, মাথাটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তার ছবি নেবার জন্য ক্যামেরা নিয়ে ঠিকঠাক করার সুযোগে জন ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে মেয়েটার কাছে আসে। মেয়েটির চোখ দুটো চকচক করে ওঠে, ফিক করে হেসে ফেলে বলে—জানতাম আপনি আসবেন।

তার কথায় জন অবাক হয়ে যায়। কোন কথা বলার আগেই সে আবার বলে চলুন ঐ পেছন দিকটায়, ওদিকটা বেশ নিরালা।

—না।

—আপনার যা ইচ্ছে দেবেন, আমি চাইব না।

—বললাম তো নির্জনে মেয়েদের সঙ্গে আমি যাই না।

প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে মেয়েটি বলল—আজ একজনও আসে নি। কালকে সবাই খাবে কী।

তার কথা জনের মনে চাবুকের মত আঘাত করে।

—রোজ অনেক লোক আসে বুঝি।

—হ্যাঁ। আমরা তো অনেক রয়েছি এখানে। কয়েকটি মেয়ে এর মধ্যেই হারিয়ে গেছে।

—লোকেরা কী করে খোঁজ পায়।

মেয়েটি মাথা নামিয়ে বলে—কয়েকজন লোক রয়েছে, তারা রোজ নতুন নতুন লোক নিয়ে আসে। দোহাই আপনার, চলুন না খুব খারাপ নয় আমার চেহারা। মেয়েটি কাঁদতে শুরু করে।

পকেট থেকে একটা নোট বের করে দ্রুত সরে আসে জন। হয়তো নাইজার নদীর তীরে নাম না জানা এক শান্ত পল্লীতে ডাগর

চোখ দুটি তুলে আকাশের দিকে চেয়ে রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত মেয়েটি। যৌবনের উচ্ছলতা আসার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল মন নিয়ে অরণ্য ঘেরা গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিত বহুদূরে অপেক্ষমান এক তরুণের দর্শন আশায়। উন্মুখ মনে উৎকর্ণ হয়ে থাকত তরুণের আহ্বান শোনার জন্য। কিন্তু নিমেষের ভূকম্পণে সবকিছু ধুলিসাৎ হয়ে গেল। কোথায় কোন এক গোপন স্থানে বসে জনকয়েক লোক কী এক কাণ্ড করে বসল যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনে নেমে এল চরম দুর্দশা।

—কোথায় গিয়েছিলেন ?

—এই একটু ওদিকে, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

—কী দেখলেন।

—মর্মান্তিক, মানুষের জীবন নিয়ে জুয়াখেলা চলছে। কঠোর হয়ে জন বলে। এই মুহূর্তে তার মন এত বিক্ষিপ্ত যে, যে কোন প্রকার মন্তব্য করতে সে কুণ্ঠিত নয়।

—চলুন।

—কাজ হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ, অনেকগুলো ছবি নিয়েছি, ফরেন প্রেসগুলো মুখিয়ে রয়েছে বিয়াফ্রার ছবি পাওয়ার জন্য।

—কেন ? তাদের স্বার্থ কি ?

– কে জানে, তবে আন্তর্জাতিক সংবাদ হিসেবে বিয়াফ্রা এখন প্রথম সারিতে, সেইজন্য বোধ হয়।

গাড়ী স্টার্ট দিল। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে রয়েছে মিস এডেনকুলে। ফাঁকা রাস্তা, হু হু করে গাড়ী ছুটছে। মাঝে মাঝেই দেখা যায় মিলিটারী ট্রাক হুস্ করে চলে যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা। সারা দেশময় একটা চরম উত্তেজনা সবসময়ের জন্য বইছে।

—বেশ আছেন, কাজ নেই কর্ম নেই, ফুর্তিতে দিন কাটান।

—খিল খিল করে হেসে ওঠে মিস এডেনকুলে—বিয়াফ্রা হওয়ার পর থেকে কত কী করছি জানেন? ইতিমধ্যে আফ্রিকা য়ুরোপের কত দেশে ঘুরতে হয়েছে জানেন?

—তাতে লাভ হয়েছে কিছু?

—নিশ্চয়ই। ফ্রান্স পর্তুগালে ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ হাত বাড়িয়েছে। কিছু আফ্রিকান দেশ হয়তো শীগগীরই বিয়াফ্রাকে স্বীকৃতি জানাবে। কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন য়ুরোপ তোলপাড় হয়ে উঠবে বিয়াফ্রা নিয়ে।

গাড়ীটা মোড় ঘুরেই থেমে গেল একটা বাড়ীর সম্মুখে।

কর্ণেল ওজুক্যু নিজের বাসভবনে বসে রয়েছেন। সামনের টেবিলে অনেকগুলো কাগজ ছড়ানো। য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত হয় এ সংবাদপত্রগুলো। আবার চোখ বুলোতে বুলোতে তিনি হৃষ্ট হয়ে ওঠেন। বিয়াফ্রার সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। নাইজিরিয়া কী অমানুষিক কার্যে লিপ্ত হয়েছে তার ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। একাধারে গণহত্যায় মেতে উঠেছে, অন্যদিকে বিয়াফ্রা অবরোধ করে লক্ষ লক্ষ রেফিউজিকে না খাইয়ে মারবার জঘন্য চেষ্টা চলছে। এমন কি যে সব সংস্থা খাদ্য দিয়ে বিয়াফ্রাকে সাহায্য করতে চায় তারাও কোন প্রকার পথ না পেয়ে খাদ্য পাঠাতে পারছে না।

বাড়ীর সামনে একটা মিলিটারী গাড়ী এসে দাঁড়াল। দ্বাররক্ষীর সেলাম গ্রহণ করে মেজর জেনারেল এফিং প্রবেশ করলেন সোজা কর্ণেলের ঘরে। পায়ের শব্দ শুনে পেছনে ফিরে চেয়ে কর্ণেল বললেন —গুড ইভিনিং মিঃ এফিং।

—গুড ইভিনিং স্যর।

—যুদ্ধের খবর বলুন।

—অত্যন্ত খারাপ। পোর্টহার্টকোর্টের ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে

—খারাপ, খারাপ, কেবল খারাপ। আপনার মুখে তো কোন সময়ে ভাল শুনতে পেলুম না।

—ভাল রয়েছে স্যর, এনুগু এলাকায় পঞ্চাশ স্কোয়ার মাইল আমরা পুর্নদখল করেছি। নাইজিরিয়ান সৈন্যকে আমাদের সেনারা ঘিরে ধরেছে। একটা কোম্পানী ইতিমধ্যে আত্মসমর্পন করেছে।

—উত্তম। এবার আমার কাছে সুখবর শুনুন। ট্যাঙ্গানিয়া, আইভরিকোষ্ট, জাম্বিয়া, গাবোন, বিয়াফ্রাকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছে। আশা করছি আরো কিছু দেশের স্বীকৃতি শীগগীরই পাওয়া যাবে। কর্ণেলের মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ আশায় বিভোর হয়ে ওঠেন তিনি।

—ব্রিটেনে আমাদের সমর্থনে সভা শোভাযাত্রা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জনমত জাগ্রত হয়েছে, নাইজিরিয়া যে হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে সবাই।

—হ্যাঁ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নিকসন নাইজিরিয়ার গণহত্যার কথা বলেছেন।

—কিন্তু স্যর গোলাবারুদের আরো ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্ণেল গম্ভীর হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন দেশ থেকে কত কষ্ট করে যে গোলাবারুদ জোগাড় করতে হচ্ছে, একমাত্র তিনিই সে খবর জানেন। পশ্চিমী দেশগুলো থেকে প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্র আনতে নানা রকম অসুবিধে দেখা যাচ্ছে, লুকিয়ে চুরিয়ে নানা ঘুরপথে আনতে হয়।

—আসুন স্যর লুই। কর্ণেল সহাস্যে অভ্যর্থনা করেন।

গম্ভীর মুখে প্রবেশ করেন বিয়াফ্রার প্রধান বিচারপতি স্যর লুই মবানেকো।

—নিশ্চয়ই কোন জরুরী ব্যাপারে ডেকেছেন কর্ণেল।

—হ্যাঁ। কমনওয়েলথ সেক্রেটারী আর্নল্ড স্মিথ মধ্যস্থ করার জন্য লণ্ডনে বিয়াফ্রা ও নাইজিরিয়ারকে উপস্থিত হবার অনুরোধ করছেন।

—হঠাৎ ব্রিটেনের এ শুভবুদ্ধি! ব্যঙ্গের সুরে বলেন স্যর লুই।

—হয়তো জনমতের চাপে। পৃথিবী শুদ্ধ সবাই আজ জেনেছে নাইজিরিয়া কী এক ভীষণ পথে যাত্রা করেছে। নরহত্যায় মেতে উঠেছে, শিশু বৃদ্ধ নারীকে অনাহারে মারার এক জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, জাগ্রত মনুষ্যত্বের শুভবুদ্ধির চাপে তাই এগিয়ে এসেছে ব্রিটেন।—কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন কর্ণেল। উত্তেজনা প্রশমিত হলে তিনি আবার বলেন—আপনি বিচক্ষণ, আমার অনুরোধ বিয়াফ্রার প্রতিনিধিত্ব আপনাকে করতে হবে।

—আমাকে ! স্যার লুই চমকে ওঠেন।

—হ্যাঁ আপনাকে। আপনার চেয়ে আর যোগ্য ব্যক্তি কে আছেন ? নাইজিরিয়া আমাদের কথা মানুক বা না মানুক জগৎসভায় বিয়াফ্রার ন্যায্য বক্তব্য পেশ করুন। সবাই জানুক বিয়াফ্রা কোন অন্যায় করেনি, মনুষ্যত্বের অপমান মুখ বুজে সহ্য করা সম্ভব হয়নি বলে, সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্যায় জুলুম সহ্য হয়নি বলেই বিয়াফ্রার সৃষ্টি।

—আপনি উত্তেজিত হবেন না স্যার। মেজর জেনারেল বললেন।

—না উত্তেজনার কোন কথা নয়।

—নাইজিরিয়ার সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করা হবে ? স্যার লুই জিজ্ঞেস করেন।

—সেই জন্যই আপনাদের ডাকা। চিফ বলছেন কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখতে পারলে সুবিধে হয়।

—হ্যাঁ স্যার। কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ থাকলে প্রস্তুতির সুযোগ পাওয়া যাবে। নবোদ্যমে আমরা আবার আক্রমণ করতে পারব।

—বলুন স্যার লুই, কী করে এ সুযোগের সৃষ্টি করা যেতে পারে।

স্যার লুই কোন কথা বললেন না। চিন্তায় তিনি নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। যুক্তিতর্কের এমন এক জাল বিস্তার করতে হবে যাতে সাময়িক ভাবে যুদ্ধ বন্ধ থাকে। বিতর্কে নাইজিরিয়াকে কোনঠাসা করে জোর করে নিজেদের পথে আনতে হবে।

—শুনুন কর্ণেল, আমাদের প্রস্তাব হবে সিজফায়ার, যুদ্ধ বিরতি এবং তারপর সমস্যা সামাধানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা।

—চমৎকার। কর্ণেল খুশি হয়ে ওঠেন।—এই প্রস্তাবই করতে হবে।

লণ্ডনে প্রাথমিক আলোচনায় স্যর লুই এই প্রস্তাব করলেন। —সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নাইজিরিয়ান প্রতিনিধি চিফ এণ্টনি এনাহোরো পাল্টা প্রস্তাব দিলেন বিয়াফ্রাকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। স্যর লুই রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল মুল সভায় সব কিছুই আলোচনা হবে। বিয়াফ্রার দ্বিতীয় প্রস্তাব, নিরপেক্ষ দেশের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু যেহেতু দ্বিপাক্ষিক সভা সেজন্য এ প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। সভার স্থান স্থির হল উগাণ্ডার রাজধানী কাম্পালায়।

উগাণ্ডার রাষ্ট্রপতি মিল্টন ওবোটেকে আমন্ত্রণ জানান হল। তিনি নিজে না থাকতে পেরে বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী সিমন ওডাকাকে প্রেরণ করলেন।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এই সভার প্রতি উদগ্রীব হয়ে রইল। তাদের আশা হয়তো নাইজিরিয়া-বিয়াফ্রা সংকট কেটে যেতে পারে। হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সভা শুরু হল। উভয় দেশের প্রতিনিধি নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য ব্যগ্র হলেন।

কিন্তু দ্রুত পট পরিবর্তন হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডার সেক্রেটারি আলফ্রেড পামার পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে বের হয়েছেন। নাইজিরিয়ার অন্যতম অফিসার জনসন ব্যাঙ্গো নিখোঁজ হলেন। সাময়িক ভাবে সভা বন্ধ রইল। স্যর লুই ফিরে এলেন লণ্ডনে। তিনি সেখানে এসে জানালেন নাইজিরিয়া যুদ্ধ চায়? বোধহয় আলোচনায় তাদের বিশ্বাস নেই।

অবশ্য স্যর লুই বিয়াফ্রায় না গিয়ে লণ্ডনে কেন গেলেন বোঝা গেল না। দুএকদিনের মধ্যেই তিনি লর্ড শেফার্ডের সঙ্গে দেখা

করলেন। কমনওয়েলথ অফিসেও তাঁকে দেখা গেল। আরো অনেকের সঙ্গেই তিনি দেখা করেন।

গম্ভীর কণ্ঠে কর্ণেল বললেন—তবে কাম্পালার সভা ব্যর্থ হল।

—হ্যাঁ। ছোট্ট উত্তর দেন স্যর লুই।

পোর্ট হার্টকোর্টের পতন হয়েছে। আরো হাজার হাজার রেফিউজি প্রতিদিন বিয়াফ্রায় প্রবেশ করছে। ধীরে ধীরে ঘোষণা করেন কর্ণেল।

—অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সঙ্গে বিয়াফ্রার জল ও স্থল পথে আর কোন যোগাযোগ নেই।

—না। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সাহায্য দেবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বিয়াফ্রায় রসদ পাঠানোর কোন পথ নেই। নাইজিরিয়া অবরোধ করে বসে রয়েছে।

চিন্তিত মুখে স্যর লুই বসে থাকেন। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। সংকটের হাত থেকে বিয়াফ্রাকে উদ্ধার করার কোন পথই খুঁজে পাওয়া যায় না। কর্ণেল ওজুকুয়ুর মনে এক একবার নতুন ভাবোদয় হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন থেকে সব কিছু ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেন।

—স্যর লুই আপনি রেডিয়োর খবর শুনেছেন?

—যুদ্ধের খবর আমি বিশেষ রাখি না।

—না যুদ্ধের নয়। আফ্রিকান সংহতি সমিতির নেতা সম্রাট হেইলি সেলাসি লিবোরিয়া, কঙ্গো, ক্যামেরুন, ঘানা এবং নাইজার যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে মধ্যস্থতা করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

—কোথায় এ সভা হবে, আমাদের যথারীতি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে?

—নাইজারের রাজধানী নিয়ামাতে সভা হবে। কর্ণেল গওন গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

—আপনি উপস্থিত হবেন না?

—ভাবছি। আমাদের গিয়ে সত্যি সত্যি কোন কাজ হবে কি

না। নাইজিরিয়ান বাহিনী এখন জয়ের পথে। তারা কি সামান্যতম সুবিধা আমাদের দেবে? তারা যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছে। হয়তো আমাদের দিন ঘনিয়ে এল স্যর লুই। হতাশায় কর্ণেলের গলা ডুবে যায়।—তাই ভাবছি গিয়ে কী হবে।

কিন্তু কর্ণেল ওজুক্য়ু শেষ পর্যন্ত গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি আইভরি কোস্টের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করেন। কমিটির সামনে তিনি জোর গলায় নিজের বক্তব্য রাখলেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় বিয়াফ্রার লক্ষ লক্ষ লোক আজ খাদ্যাভাবে অর্ধমৃত জীবন যাপন করছে। নাইজিরিয়ার অবরোধের ফলে এই সব মানুষের দুর্গতির সীমা নেই। সুতরাং নাইজিরিয়াকে জল ও স্থল পথে রাস্তা দিতে হবে। বিয়াফ্রার ফেরার পথে তিনি আইভরি কোস্টের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আবার দেখা করলেন। বলাবাহুল্য নিয়ামার সভা ফলবতী হয় নি।

কিন্তু কর্ণেল ওজুক্য়ু প্রেস কনফারেন্স ডেকে আগামী দিনে আদ্দিস আবাবায় শান্তি-সভার কথা ঘোষণা করলেন।

—আপনি কি মনে করেন আদ্দিস আবাবার সভায় কোন বিশেষ ফল পাওয়া যাবে।

—আমার বিশ্বাস পাওয়া যাবে।

—আপনার এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি? আর একজন সাংবাদিক জিগ্যেস করে।

—নিয়ামার সভার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে।

—নাইজিরিয়া তো স্থলপথ দিতে রাজি হয়েছিল, তারা আবার রাজি হবে। শুধু-পথের প্রশ্ন নয়, আরো প্রশ্ন রয়েছে, সে সব আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

—আপনি কি যুদ্ধবিরতির কথা বলতে চাইছেন।

—না। রাজনৈতিক সংকট প্রথমে সমাধান করতে হবে তারপর যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা।

—আপনি কি জানেন না কর্ণেল গওন বিয়াফ্রা বলে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানে না ? সুতরাং রাজনৈতিক সংকট আবার কি ?

—কর্ণেল গওন না মানতে পারেন, পৃথিবীর অনেক দেশ বিয়াফ্রাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আশা করি আরো দেশ তাদের অনুসরণ করবে।

—কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পশ্চিমী সমরাস্ত্র পাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কি আলোচনা হয়েছে ?

—সে আপনাদের জানার প্রয়োজন নেই।

কর্ণেল এ প্রশ্নে অত্যন্ত চটে যান। কোন জবাব না দিয়ে বলেন—আদ্দিস আবাবায় শান্তি আলোচনা হবে, শুধু এ কথাই আমি জানাতে চাই। অস্ত্র সম্বন্ধে যখন বলার থাকবে, তখন আপনাদের খবর দেব।

কর্ণেল ওজুকুয়ু আইভরি কোস্টের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আদ্দিস আবাবায় এসে পৌঁছলেন।

সেদিন ২৯ জুলাই ১৯৬৮।

আদ্দিস আবাবায় সম্রাটের রাজপ্রাসাদে সভা বসেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান বা তাঁদের প্রতিনিধি, অন্যান্য কূটনীতিকবৃন্দ, প্রেস-রিপোর্টার, টেলিভিসনের লোকজনে গমগম করছে সভা। সম্রাট হেইলি সেলাসি গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছেন। একপাশে নাইজিরিয়ার প্রতিনিধি এনাহোরো, অপর দিকে কর্ণেল ওজুকুয়ু স্বয়ং। ওজুকুয়ু সত্তর মিনিট ধরে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা করলেন। যুদ্ধবিরতি নিয়ে একটি কথাও বললেন না, তীব্রভাষায় নাইজিরিয়াকে আক্রমণ করে দেখাতে চাইলেন কি ভাবে নাইজিরিয়াকে বিয়াফ্রাবাসীকে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এমনকি নাইজিরিয়াকে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে তুলনা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হলেন না।

কিন্তু আদ্দিস আবাবার সভায় কোন ফল হল না। বিয়াফ্রার

একগুয়েমির জন্য, তাদের বিচ্ছিন্নতার মতবাদের জন্য, সভা শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে গেল।

সেপ্টেম্বের মাসে আলজিয়ার্সে অরগ্যানিজেশন অফ দি আফ্রিকান ইউনিটির সভা বসল। দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁরা বিয়াফ্রাকে প্রকারান্তরে আত্মসমর্পন করার নির্দেশ দিলেন।

কর্ণেল ওজুক্যুর সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হল। যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যতরকমের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, সবই বুঝি এই মুহূর্তে ভেসে যায়। বিয়াফ্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী আবা, তার পতন হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে গেছে। এই সময় প্রচণ্ডতম দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এল টেলিফোনের তার।...

—কর্ণেল স্পিকিং...

—যে বিমানে গোলা বারুদ আসছিল তা গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

—কি ? কিছু বুঝছি না পরিষ্কার করে বলুন।

—নাইজিরিয়ান বাহিনী আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের খবর পেয়েছে, গোলা বারুদশুদ্ধ বিমান ওরা গুলি করে নামিয়ে দিয়েছে।

—কি করে খোঁজ পেল, নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে ওদের গুপ্তচর রয়েছে।

—সেটা থাকা খুবই সম্ভব।

—সম্ভব নয় নিশ্চয়ই আছে। ভাল করে খোঁজ করুন, এই মুহূর্তে তাদের বন্দী করার ব্যবস্থা করুন।

—ইয়েস স্যর।

—কি করে এসব হয় কিছুই বুঝছি না। ওপথে আর অস্ত্র আনা চলবে না, নতুন পথের সন্ধান করুন।

—চেষ্টা করছি স্যর, তবে চতুর্দিকে নাইজিরিয়ান বাহিনী, কোন কাজ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

—একটা কাজ আপনাদের দিয়ে হয় না। আপনারাও কি সব গওনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন ?

ধপ্ করে রিসিভারটা রেখে দেন কর্ণেল। সামনের ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। একটা লাল পেন্সিল দিয়ে বিয়াফ্রার চতুর্দিকে দাগ দিতে শুরু করেন। এই দেড় বছরের মধ্যে বিয়াফ্রা কতটুকু হয়ে গেছে। একটা বিরাট অক্টোপাস চারদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। শত চেষ্টা করেও সেই মৃত্যুবন্ধন খোলা সম্ভব হচ্ছে না। উঃ অসহ্য এই যন্ত্রনা!

না, সৈনিক তিনি। কাপুরুষের মত পেছু হটতে শেখেন নি। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। যে গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছেন তার থেকে বেরুনোর কোন উপায় নেই। যুদ্ধ তাঁকে চালিয়ে যেতেই হবে।

অনেক হাল্কা বোধ করছেন তিনি। দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের পর যেমন বোধ হয়, অনেকটা সেই রকম। খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে। রেডিও খুলে গান শোনার ইচ্ছে মনের এক গোপন কোণে জমা হয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে রেডিয়ো খুলে দেন। সেণ্টার ঘোরাতে ঘোরাতে লাগোস সেণ্টারে এসে রেডিয়ো বাজতে শুরু করে। সুন্দর লোকসঙ্গীত ভেসে আসছে। অনেক অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ে যায়। তখন তিনি সিভিল সার্ভিসে কাজ করেন। রাত করে গ্রামের পথ দিয়ে ফেরার সময় এমনি একটা সুর শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আজ আবার সেই সুর শুনে বহু পুরণো দিনের কথা মনে করিয়ে দিল। যদি বিয়াফ্রার সৃষ্টি না হত, আজ নিশ্চিন্ত মনে এই গান শুনতে পারতেন। কি দর দরকার ছিল বিয়াফ্রা সৃষ্টি করার?...

চমকে ওঠেন কর্ণেল নিজের মনের গতিপথ লক্ষ্য করে। এ কি ভাবছেন তিনি!

আবার কঠোর হয়ে ওঠে তাঁর মুখমণ্ডল। রেডিয়ো বন্ধ করে

দেবার জন্য হাত বাড়াতে গিয়ে থেমে যান তিনি। খবর শুরু হয়েছে। নিবিষ্ট মনে খবর শোনেন। কিন্তু পরমুহূর্তে চমকে ওঠেন। নাইজিরিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত য়ুনিয়নের চুক্তি হয়েছে। নাইজিরিয়া পুনর্গঠনে সোভিয়েট সাহায্য করবে, এমন কি তাদের টেকনিসিয়ানের সাহায্যে স্টিল ফ্যাক্টরিও স্থাপিত হবে। সাহায্যের তালিকায় আরো অনেক কিছু রয়েছে।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে কর্ণেল ওজুক্যুর। নাইজিরিয়া তবে কম্যুনিষ্ট দেশের সাহায্য নিতে আরম্ভ করল, ইঙ্গ মার্কিন এবার কি বলবে? নিজের মনেই তিনি হেসে ওঠেন। অস্ত্রের অভাব হয়তো আর হবে না। বিভিন্ন জায়গা থেকে সরাসরি সাহায্য পাওয়া যাবে।

দূর থেকে একটা গাড়ী এদিকে আসতে দেখা যায়। গাড়ীর বনেটে বিয়াফ্রার পতাকায় উদিত সূর্য জ্বল জ্বল করছে। দেখতে বেশ লাগে কর্ণেলের।

—বলুন, কী দুঃসংবাদ শোনাতে এসেছেন।

চিফ কর্ণেলের কথায় হেসে ফেলেন। তারপর বলেন—সুসংবাদ অনিৎশার পথ আমাদের সৈন্য বাহিনী দখল করেছে।

—চিয়ার আপ, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানিনা। এ যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য। যুদ্ধের গতি এবার থেকে দারুণ ভাবে মোড় নেবে।

—কি বলছেন কর্ণেল, কিছুই বুঝতে পারছিনা। এফিয়ং অবাক হয়ে কর্ণেলের দিকে চেয়ে থাকেন।

—নাইজিরিয়া সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করেছে, এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই?

হো হো করে হেসে ওঠেন কর্ণেল।

—দেশের জন সাধারণকে নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ-যুদ্ধ আমার নয়। তাদের যুদ্ধ, এ-যুদ্ধ বাঁচার যুদ্ধ। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে মিঃ এফিয়ং। শুধু আমি আপনি অংশ নিলেই

বিয়াফ্রাকে বাঁচানো যাবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের সদিচ্ছা আর সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে বিয়াফ্রা আবার বেঁচে উঠবে। দেশের প্রবল জনমতের চাপে নাইজিরিয়াকে পেছু হটতে হবে। য়ুরোপ আমেরিকায় ইতিমধ্যেই আমাদের সমর্থনে বহুলোক এগিয়ে এসেছে, আরো আসবে। অনেক দেশে বিয়াফ্রা এড কমিটি হয়েছে।

—কিন্তু দেশের মধ্যেই যে গণ্ডগোল রয়ে গেছে।

—কি রকম ?

—ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজান্টস্ পার্টির লোকেরা গোপনে যুদ্ধবিরোধী কথা বলছে। মানুষের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করছে।

—দলে পিষে শেষ করে দিন। নাইজিরিয়াকে বুঝিয়ে দেব গায়ের জোরে আমাদের দমন করা করা যায় না। কারো উস্কানিতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইনি। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে হয়েছে। কতটুকু শক্তি গওনের, দেখে যাক দেড়কোটি বিয়াফ্রাবাসী কি করে নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষা করে।

চিফ আর কোনও কথা বললেন না। যে প্রয়োজনে এসেছিলেন তা আর বলা হল না। কর্ণেলের মুখে আশাব্যঞ্জক কথা শুনে তিনি নিজেও মোহিত হয়ে গেছেন। দিনের পর দিন পরাজয়ের যে গ্লানি তাঁর মধ্যে অনড় হয়ে বাসা বেঁধেছিল কর্ণেলের কথায় কালবৈশাখীর ঝড়ে তৃণগুচ্ছের উড়ে যাওয়ার মত করে উড়ে গেল।

আবার নতুন করে পরিকল্পনা করতে হবে, দেশকে আহ্বান জানাতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে দুর্ধর্ষ গতিতে।

॥ আট ॥

বিয়াফ্রার ভৌগোলিক সীমানা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। নাইজিরিয়া বাহিনীর প্রচণ্ড চাপ সহ্য করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পুনর্বাসন এক নিদারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে দেখা দিয়েছে অসাধারণ খাদ্য সমস্যা। প্রোটিন খাদ্যের অভাবে কয়েক লক্ষ শিশু মৃত্যুপথ যাত্রী। মানুষের মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে, যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকাশ্যেই মানুষের জিজ্ঞাসা এ যুদ্ধে কী লাভ হল? কে দায়ী এর জন্য।

কর্ণেল ওজুকয়ু নাইজিরিয়ার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ করেছেন। য়ুরোপের কাগজগুলোতে ফলাও করে সে খবর ছাপানো হয়েছে। মহমোন্য পোপ পলও এ অভিযোগের কথা বলেছেন। কিন্তু মানুষ আর এ অবস্থা সহ্য করতে রাজী নয়। যুদ্ধের বিভীষিকা সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়েছে। ইবাদানে ছাত্র-শ্রমিক একসঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরাট শোভাযাত্রা করেছে। লাগোসে পোপের বিরুদ্ধে ছাত্ররা বিক্ষোভ জানিয়েছে।

বিয়াফ্রার রাস্তাঘাট কঙ্কালসার শিশুতে ভরে গিয়েছে। খাদ্য চাই। সর্বত্র হাহাকার। একমুঠি অন্ন দাও। করুণ চোখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে দেখলে মনে হয়না এরা মায়ের সন্তান। বাজারে গেলে দেখা যায় নিদারুণ হাহাকারের বীভৎস দৃশ্য। ইঁদুর, টিকটিকি খাদ্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। রাস্তাঘাটে কুকুর আর নেই বললেই চলে। কেন এমন হল?

এই কথা আকুয়াও বলে—বলুন, কেন এমন হল? লক্ষ লক্ষ

নিরীহ ইবো, এরা এমন কী দোষ করেছে যার জন্য তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে ?

—যুদ্ধে কোন মঙ্গল নেই, এ কথা তো আপনি জানেন মিঃ

—যুদ্ধ কে চায় এখানে কর্ণেল ওজুকয়ু ছাড়া, কেউ আর যুদ্ধ চায় না। প্রতিটি মানুষ একমুঠো খাবারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। প্রত্যেকেই যুদ্ধ বিরোধী, কিন্তু ভয়ে কেউ কোন কথা বলছে না, যারা বলছে তাদের ওপরে আসছে আঘাত। অধ্যাপক ওদিপিয়ো গ্রেপ্তার হয়েছেন যুদ্ধ বিরোধী মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে।

চমকে ওঠে অশোক। ধীরে ধীরে বলে—কবে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

—দিন কয়েক আগে। সাম্প্রদায়িকতার ওপর দাঁড়িয়ে কোন জাতি বড় হতে পারে না মিঃ রয়। কর্ণেল ওজুকয়ুর ইবো সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়েছে। আফ্রিকার মধ্যে নাইজিরিয়া একটি বিশিষ্ট দেশ, সেখানে গৃহ বিবাদ জিইয়ে রাখতে চায় স্বার্থান্বেষী শক্তি। কিন্তু আমরা তাদের সে সুযোগ দেব কেন ?

—আচ্ছা মিঃ আকুয়া, নাইজিরিয়া অধিকৃত অঞ্চলে যে সব ইবোরা রয়েছে তাদের কোন খবর পান ?

—নিশ্চয়ই। প্রথমে তারা ভয় পেয়েছিল, ভেবেছিল শত্রুপক্ষ বলে অত্যাচারিত হবে। কিন্তু কর্ণেল গওনের চোখে কেউ ইবো, কেউ হোসা নয়, সবাই নাইজিরিয়ান। বিরাট সম্ভাবনাময় কৃষ্ণ আফ্রিকার এই দেশটিকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। সেখানকার ইবোরা এখানকার চাইতে অনেক সুখে রয়েছে। কর্ণেল গওনের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা নেওয়ার কোন ইচ্ছে নেই, তিনি যথার্থই দেশপ্রেমিক।

কড়া নাড়ার শব্দ হতেই অশোক গিয়ে দরজা খুলে দেয়। একজন নিগ্রো তার সঙ্গীকে নিয়ে প্রবেশ করে। সঙ্গীটি নিখুঁত য়ুরোপীয়

পোষাকে সজ্জিত, তবে দেখেই বোঝা যায় যে নিগ্রো নয়। তারা দুজনেই তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সঙ্গীটি আস্তে আস্তে বলে—অশোক, বিদায় নিতে এসেছি, আর কোন দিন দেখা হবে কিনা জানি না।

গলার স্বরে চমকে ওঠে অশোক। এ সাজে কেন মীরা! সেই রহস্যময়ী তরুণী কোথায়! নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বলে—কী ব্যাপার, বসুন।

—বসার সময় নেই, পুলিশ হয়তো এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে। প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আমাকে ভারতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, হয়তো আর কোনদিন তা হয়ে উঠবে না। জলে ভরে ওঠে মীরার চোখ দুটো।

—কিন্তু এভাবে কেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

মৃদু হেসে মীরা বলে—এর আগেও কি কোনদিন কিছু বুঝতে পেরেছ? বিয়াফ্রায় বিভিন্ন দেশের চর ঘুরে বেড়ায়, দেশ-বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হয়। তাদের সঙ্গে মিশে সেইসব সংবাদ নাইজিরিয়ায় পাচার করতুম। কিন্তু কিছুদিন ধরেই আমাকে সন্দেহ করছে। গোপনে পালিয়ে যাচ্ছি নাইজিরিয়ায়। চললাম, আর সময় নেই।

মীরাকে বিদায় দিয়ে রাস্তার ধারের জানালায় এসে দাঁড়ায় তারা। নিগ্রোটি অপেক্ষমান গাড়ীটিতে উঠে স্টার্ট দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো পুলিশের গাড়ী দ্রুত সেই দিকে অনুসরণ করে। একটু পরেই আর একটা গাড়ী এসে মীরাকে তুলে নিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা সেইদিকে চেয়ে থাকে। তারপর চুপচাপ। ঘরে বসে থাকে দুজনেই। কারুর মুখে কোন কথা নেই। কী বলবে আর? দিনের পর দিন জ্বলন্ত মোমের মত বিয়াফ্রা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কর্ণেল ওজুকয়ু কি বুঝতে পারছেন না? একটা জাতির অস্তিত্ব বড় না একজন মানুষের জেদ বড়? পৃথিবীব্যাপী বিয়াফ্রা নিয়ে এত হৈ হৈ করা

হল, কিন্তু কি হয়েছে তাতে? কেউ হয়তো তাকে সমর্থন করেছে, কেউ হয়তো তাকে দোষারোপ করেছে, কিন্তু দেড় কোটি মানুষের কী সুবিধা হয়েছে? জীবন ধারণের জন্য যে সামান্য প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারছে না তারা। আজকের মানুষ মৃত্যুর কবলে এগিয়ে যাচ্ছে, আর ভবিষ্যতের বংশধররা তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের অতলে।

—এক এক সময় মনে হয় কি জানেন মিঃ রয়, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। চীৎকার করে বলি এযুদ্ধ কার স্বার্থে। যুদ্ধ বন্ধ কর। আমরা সবাই নাইজিরিয়ান। কিন্তু পারি না। বেদনায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে আকুয়ার মুখ।

—বিয়াফ্রার পরাজয় নিশ্চিন্ত মিঃ আকুয়া। কর্ণেল গওনের বিরুদ্ধে পশ্চিমে যতই প্রচার হোক, তিনি অবিচল।

—গওনকে তারাই গালাগাল দেয়, যাদের স্বার্থসিদ্ধিতে তিনি বাধা দিয়েছেন। তাঁর হৃদয় অনেক প্রশস্ত।

—একমাত্র উলি বিমান বন্দর পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। এইটি হাত ছাড়া হয়ে গেলেই বিয়াফ্রার মৃত্যু নিশ্চিত।

—আমাদের মৃত্যু হতে পারে না। আকুয়ার মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আমরা আবার বাঁচব। একজনের মর্জির জন্য এই দেড় কোটি মানুষ নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। এমনিতে অনেক মরেছে, অনেক রক্ত বয়ে গেছে নাইজার নদী দিয়ে, আর নয়। আমাদের বাঁচতেই হবে।

বর্তমান রাজধানী ওয়েরি নগরী থেকে মাইল কয়েক দূরে এক গ্রামে আত্মগোপন করে রয়েছেন কর্ণেল ওজুকয়ু। জঙ্গলের মধ্যে এই বাড়ীটা থেকেই তিনি যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন। নাইজিরিয়ান বাহিনী তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে। বিয়াফ্রার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ, খাদ্যের অভাবে তারা নিজ নিজ দল ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে।

হাজার হাজার সৈনিক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে, এমন কি নিজেদের সূর্য-চিহ্নিত পোষাক ত্যাগ করে শুধু মাত্র হাফপ্যান্ট পরে শরণার্থী দলের সঙ্গে মিশে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে।

চমকে উঠলেন কর্ণেল। জঙ্গলের মধ্য থেকে কিসের যেন আওয়াজ ভেসে আসছে। তবে গওনের সৈন্যবাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য এগিয়ে আসছে! ডান হাতে রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সম্মুখের দিকে চেয়ে যে-কোন ঘটনা ঘটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ঐ তো শব্দ আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। এখুনি হয়তো ওরা এসে পড়বে। কোথায় যেন বোমা পড়ার শব্দ হতে থাকে। পাহারারত সৈনিককে চিৎকার করে ডাকেন তিনি, না কেউ সাড়া দিল না। তবে কি সবাই তাকে ত্যাগ করে গেল? তবু তিনি এতটুকু পেছপা হবেন না। সম্মুখে বিয়াফ্রার ম্যাপটা জ্বল জ্বল করছে। বার বার সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত শিহরণ বোধ হয়।

আর্মার্ডকারের সুস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে। কর্ণেল ছুটে গেলেন ভেতরের দিকের ঘরে। পরিবারের অন্যান্য লোকজনদের সাবধান করে দিয়ে আসেন তিনি। গুলিভরা রাইফেল উঁচিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকেন। অন্তত বীরের মতো মৃত্যু বরণ করবেন।

গাড়ীটা তীব্র সার্চলাইট জ্বেলে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। আলোর উজ্জ্বলতায় সমস্ত বনভূমি উদ্ভাসিত করে কর্ণেলের চোখ ঝলসিয়ে দেয়। গঁ গঁ শব্দ করতে করতে গাড়ীটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপরের ঘুমন্ত পাখীগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করে ডানা ঝটপট করতে থাকে। রাইফেল তাগ করে সামনের দিকে অবিচল হয়ে চেয়ে থাকেন কর্ণেল। অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা পেঁচার সুতীব্র চিৎকারে বোধহয় তাঁর হাতদুটো একটু কেঁপে ওঠে। আবার তিনি মনোযোগ সহকারে সামনের দিকে স্থির নেত্রে চেয়ে থাকেন।

গাড়ীটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করা উচিত হবে না, রেঞ্জের মধ্যে এসে গেছে। এক···দুই···তিন···একি করছেন তিনি! গাড়ীর সামনে সূর্যলাঞ্ছিত পতাকা হাওয়ায় উড়ছে। রাইফেল নামিয়ে নিয়ে স্বল্প কেশযুক্ত মস্তকে একবার হাত বুলোন। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছেন।

মেজর জেনারেল ফিলিপ এফিয়ং এবং অন্যান্য অফিসাররা কর্ণেলকে অভিবাদন জানান। কর্ণেলের সঙ্গে তাঁর অফিসারদের সভা শুরু হয়। রাজধানীতে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী বার বার হানা দিতে শুরু করেছে। যুদ্ধ শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেচে, এখন আত্মসমর্পন করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। কিন্তু কর্ণেল আত্মসমর্পন করতে কিছুতেই রাজী নন তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করে যাবেন। এখনো যে সমস্ত সৈন্য তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছে তাদের নিয়েই তিনি যুদ্ধ করবেন। মেজর জেনারেল বার বার যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন।

বুম বুম।···আবার কোথায় খুব কাছেই বোমা পড়ল। চঞ্চল হয়ে ওঠেন তাঁরা। মেজর জেনারেল বারবার কর্ণেলকে অনুরোধ করেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এই মুহূর্তে আত্মসমর্পন করতে হবে।

রাজধানীতে নাইজিরিয়ান সৈন্যবাহিনী ঢুকে পড়েছে। কর্ণেল দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে সোজা উলি বিমান বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

কর্ণেলের রাজধানী ত্যাগের খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়ে।

উলি বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে মারসেডেজ বেনজ গাড়ী ছুটে চলেছে। পেছনে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর হল্লা স্পষ্ট শোনা যায়। টপ গিয়ারে গাড়ী ছুটে চলেছে। মুহূর্তমাত্র দেরী করার সময় নেই। যে কোন মুহূর্তে হয়তো ধরা পড়ে যেতে পারেন।

বিমান বন্দরে এসে স্তম্ভিত হয়ে যান কর্ণেল। ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। ইদানীং মাত্র তিনটে করে বিমান ছাড়ে এখান থেকে। বন্দরের সমস্ত শ্রমিক পালিয়েছে।

ফট ফট ফট···গুলির আওয়াজে চমকে ওঠেন কর্ণেল। নাইজিরিয়ান বাহিনী বিমান বন্দর আক্রমণ করেছে। গুলির আঘাতে রানওয়ের কয়েকটি আলো নিভে যায়। আবার গুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণওয়ের অনেকটা নষ্ট হয়ে যেতেই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন কর্ণেল। অবরুদ্ধ বিমান বন্দরে তাঁর পরিবারের লোকজন ছাড়া মাত্র তিনজন সাহায্যকারী রয়েছে। আবার গুলির আওয়াজ ভেসে আসে। না আর কোন উপায় নেই, এবার হয়তো ধরা পড়তেই হবে। চঞ্চল হয়ে ওঠেন তিনি। শেষ বারের মত জন্মভূমির দিকে ফিরে তাকান। হয়তো এই মুহূর্তে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। অপেক্ষমান বিমানে ছুটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করতেই বোঁ বোঁ করে প্রপেলার ঘুরতে থাকে। মাটি ত্যাগ করে আকাশে উঠতেই আবার আওয়াজ হয় দুম দুম।···

কর্ণেল ওজুকয়ু শেষ বারের মত চেয়ে দেখেন তার মাতৃভূমিকে। এখানকার ধূলোবালি তাঁর সর্বাঙ্গে লেপে রয়েছে, এখানকার আলো হাওয়া রূপরস গন্ধ ভরে রয়েছে তাঁর হৃদয় মনে।

বিমান ছুটে চলেছে আইভরি কোস্টের দিকে। কর্ণেল আগে থেকেই লণ্ডন এবং জুরিখে ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট করে রেখেছেন।

কর্ণেলের দেশ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এফিয়ং ঘোষণা করলেন বিয়াফ্রার অস্তিত্ব আর নেই, তিনি আত্মসমর্পন করছেন।

যুদ্ধ শেষ। এই খবর সমগ্র নাইজিরিয়ায় বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার লোক ঘর ছেড়ে রাস্তায় বের হয়ে পড়েছে। মোড়ে মোড়ে মানুষের জটলা আর জল্পনা কল্পনা চলছে।

অশোক ছুটে চলে সংবাদ প্রেরণ করার জন্য। গিয়ে দেখে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে

সর্বপ্রথম সংবাদ প্রেরণ করতে চায়। কিন্তু কিছুতেই লাইন পাওয়া যায় না। বারবার ভুল নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে খবর পাঠান প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এত সংবাদ প্রেরিত হচ্ছে যে সমস্ত ব্যবস্থা বারবার ভেঙ্গে পড়ছে। কারুর প্রেরিত সংবাদ হয়তো নিজ অফিসে না গিয়ে ভুল যোগাযোগের ফলে কোন ফ্যাক্টরিতে বা অফিসে গিয়ে পৌঁছে যায়। ব্যতিব্যস্ত হয়ে সাংবাদিকের দল ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও তারা কোন সুরাহা করতে পারছে না। সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বারবার।

লাগোসে ব্যতিব্যস্ততা আরো বেশী। মানুষজন ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। রাস্তাঘাট দিয়ে সৈনিকরা ইচ্ছেমতো যাতায়াত করছে। যুদ্ধের যে-উন্মাদনা ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে সংবাদিকের দল ছুটে আসছে লাগোসে।

এই সময়ে আর একটি বিমান এসে পৌঁছল লাগোস বিমান বন্দরে। সে বিমান থেকে পাঁচ-ছজন আরোহী নেমে এলেন। শ্রান্ত, নিঃশেষিত তাঁরা. জীবনের ভার যেন আর বইতে পারছেন না।

বহুদিন পরে নিশ্চিন্ত মনে সারারাত ঘুমানোর পরে মেজর জেনারেলের মন বেশ স্ফূর্তিতে ভরে উঠল। লাগোসের সহরতলীতে দোদান মিলিটারী ব্যারাকে তিনি চলেছেন সঙ্গীদের নিয়ে। হু-হু করে ছুটে চলেছে গাড়ী নির্জন রাস্তা দিয়ে। আজ ১৯৭০ সালের ১৪ জানুয়ারি, বিয়াফ্রা আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পন করবে। মাত্র দুদিন আগে তিনি ঘোষণা করেছেন, বিয়াফ্রা অধিবাসী মোহমুক্ত।

নাইজিরিয়ান সরকারের প্রধান গওনের সামনে মেজর জেনারেল বললেন, **We are Loyal Nigerian citizen and we accept the authority of the Federal Military Govt. of Nigeria the Republic of Biafra ceases to exist.**

শেষের দিকে তাঁর গলা ধরে এসেছে। তাঁর কথা শেষ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে গওন এফিয়ংকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যেন কনিষ্ঠকে নিজের হৃদয়ে দিলেন আশ্রয়। সেখানে যারা ছিলেন তাঁরা গওনের মহত্ত্বে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মাথা নীচু করে দাঁড়ালেন।

আড়াই বছর ধরে যিনি যুদ্ধ করে দেশকে সর্বনাশের মুখে দাঁড় করিয়েছেন তাঁর প্রতি প্রতিহিংসা নয়, তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন, ক্ষমা কর তাঁকে। এত বড় মহত্ত্ব ইতিহাসে বিরল। ইয়াকুবু গওনের নাম সারা পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে অন্ততঃ এই একটি ঘটনার জন্য।

সকলেই গওনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিছুতেই তার সঙ্গে কারও দেখা হয়ে ওঠে না। অনেক চেষ্টার পর সাংবাদিকরা তাঁর দেখা পেল। তাঁর পাশের টেবিলে স্যাণ্ডবার্গের লেখা লিঙ্কনের জীবনী রয়েছে। জাতীয় সমস্যার উপরে তিনি লিঙ্কনের জীবনী থেকে উদ্ধৃতি করে বললেন। তিনি জানালেন ইবোরা তাঁর শত্রু নয়।

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করার ফলে তিনি কি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন না? একজন সাংবাদিকের ঐ কথার জবাবে সহাস্যে তিনি জানালেন যে ভাল খেলোয়াড়ের মত তিনি নিজের কাজ করে গিয়েছেন।

বিয়াফ্রার পতনের পর থেকে কর্ণেল গওন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নাইজিরিয়া পুনর্গঠনের জন্য। রেডিয়ো থেকে বার বার ঘোষণা করা হল, শান্ত হয়ে ধৈর্য ধর, সাহায্য তোমাদের কাছে পাঠান হবে।

অনেকেই ভেবেছিল হয়তো তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য কোন হৌসা অফিসার নিযুক্ত করবেন অধিকৃত অঞ্চলে। কিন্তু তারা অবাক হয়ে গেল একজন ইবো অধ্যাপককে প্রশাসকরূপে নিযুক্ত হতে দেখে।

গওন ঘোষণা করলেন যে তিনি রাজনীতিক নন, তাঁর কোন উচ্চাকাঙ্খাও নেই। দেশে শান্তি ফিরে এলেই বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে।

অধিকৃত অঞ্চলের অসংখ্য মানুষকে নিয়মিত খাদ্য যোগান অত্যন্ত দুরূহকাজ। বিভিন্ন দেশ থেকেই অনেকেই ছুটে এল পরাজিত বিয়াফ্রায় খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য সাহায্যের ডালি নিয়ে। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন গওন, এদের সাহায্যের অন্তরালে স্বার্থের উদ্যতথাবা দেখে। পশ্চিমী দেশগুলো সাহায্যের নাম করে নাইজিরিয়ার অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ করা হল। যুদ্ধের সময় বিয়াফ্রাকে যারা সাহায্য করেছে তাদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য নিতে রাজী হলেন না গওন। তিনি ঘোষণা করলেন, "Let them keep their blood money."

বিয়াফ্রা পরাজিত। নাইজিরিয়ার সমস্যা আজ আবার নতুন করে ভাবতে হবে। কৃষ্ণকায় আফ্রিকার সম্পদ দেখে যে পশ্চিমী শক্তি একদা নাইজিরিয়াকে নিজেদের উপনিবেশে রূপান্তরিত করেছিল, বিয়াফ্রার মধ্য দিয়েই তাঁদের প্রেতাত্মা আবার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু পাঁচ কোটি নাইজিরিয়ান সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

পাঁচকোটি মানুষ আজ আবার আশা ভরসা ভালবাসা দিয়ে নতুন এক নাম সৃষ্টি করেছে। সে নামের সঙ্গে লেগে রয়েছে নাইজিরিয়ার ধূলোবালি। নাইজার নদীর জলে স্নাত সে নাম, সূর্যরশ্মিতে পূত সে নাম, অসংখ্য মানুষ মানুষের মুখে মুখে ফেরে সে নাম—অখণ্ড নাইজিরিয়া।